দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

রামমন্দির কংগ্রেসের কাছে শাঁখের করাত পৃঃ ১১

সনাতন হিন্দু ধর্মকে ছোটো করার চেষ্টা সফল হবে না —পৃঃ ২৩

৭১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ১২ নভেম্বর ২০১৮।। ২৫ কার্তিক - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার

বিতর্কে শবরীমালা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ২৫ কার্তিক, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১২ নভেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

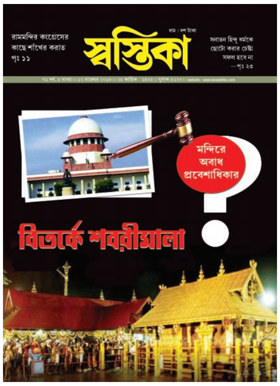

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ

 ডা: মদনলাল চৌধুরী ৬

খোলা চিঠি : দিদি আপনিই দেবী সুন্দর মৌলিক ৭

আধুনিক ভারতের প্রথম রূপকার নরেন্দ্র মোদী ৮

রামমন্দির কংগ্রেসের কাছে শাঁখের করাত

 রন্তিদেব সেনগুপ্ত ১১

স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার স্বরূপ

 ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ১৩

বঙ্গের লুটিয়েন মিডিয়ার লাঠিধারীরা

 তুষারকান্তি সরকার ১৫

তৃণমূলের পুজোর দখলনীতি ব্যুমেরাং হয়েই ফিরবে

 সনাতন রায় ১৬

গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভ্রান্তি ও প্রাসঙ্গিকতা

 ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮

খ্রিস্টান মিশনারিদের ষড়যন্ত্র ২২

সনাতন হিন্দুধর্মকে ছোটো করার চেষ্টা সফল হবে না

 সুমিত্রা ঘোষ ২৩

শবরীমালায় অশান্তি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র

 ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭

পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা শিল্প চূড়ামণি হাটি ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত সলিল গেঁউলি ৩৩

গল্প : হাতছানি শেখর সেনগুপ্ত ৩৫

হিন্দুত্ববাদীরা কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না

 রজতভূষণ দাস ৪৩

দেশসেবার সূত্রে এক মারাঠি যুবকের বাঙালি হয়ে ওঠা

 ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ সুস্বাস্থ্য: ২১ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯

চিত্রকথা : ৪০ খেলা : ৪১ রঙ্গম : ৪৯

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৯ নভেম্বর ২০১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রামমন্দির নিয়ে টালবাহানা

রাম ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতীকপুরুষ। রামমন্দির নির্মাণ ভারতের জাতীয় সত্তারই নির্মাণ। অথচ দেশের সর্বোচ্চ আদালত রামমন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত মামলা নিয়ে টালবাহানা শুরু করেছেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে মামলার শুনানি। প্রশ্ন হলো, দেশের অগণিত মানুষ যে মন্দিরের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন, তাদের প্রতি আদালতের এই অবহেলা কেন? কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল উনিশের লোকসভা নির্বাচনের পর মন্দির সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির আর্জি জানিয়েছেন বলেই কি? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এই নিয়ে কয়েকটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অমৃতলাল ধর, শচীন সিংহ প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নারীর অধিকার, না অন্য উদ্দেশ্য?

কেরলের শবরীমালায় ভগবান আয়াপ্পার মন্দিরটি এখন বিতর্কের শীর্ষে। বলিতে গেলে শবরীমালার মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া এই বিতর্কটির জন্ম দিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়। সুপ্রিম কোর্ট তাহার সাম্প্রতিক রায়ে শবরীমালা মন্দিরে ঋতুযোগ্য মহিলাদের প্রবেশাধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞাটি খারিজ করিয়াছে। অথচ শবরীমালা মন্দিরের এই প্রথাটি কিন্তু আয়াপ্পা গোষ্ঠীর একটি প্রাচীন প্রথা। আয়াপ্পা গোষ্ঠীর মতানুযায়ী এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতা চির ব্রহ্মচারী। অতএব, এই মন্দিরটিতে ঋতুযোগ্য মহিলাদের প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নহে। আয়াপ্পা গোষ্ঠীর মহিলারা অতীতেও এই প্রাচীন প্রথাটির বিলুপ্তিকরণের দাবি তোলেন নাই। ইয়ং লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে নওসাদ আহমেদ খান নামক এক ব্যক্তি এই প্রথাটি বিলোপ করিবার দাবি লইয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট তাহার ভিত্তিতেই এই রায়টি প্রদান করিয়াছে। এই রায়ের পরে বামপন্থী, অতিবামপন্থী এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী আহ্লাদিত হইয়াছে। তাহারা আবদার ধরিয়াছে, ঋতুযোগ্য মহিলারাও শবরীমালার আয়াপ্পা মন্দিরে প্রবেশ করিবে। যদিও আয়াপ্পা গোষ্ঠী সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের বিরোধিতা করিয়া পথে নামিয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধকরণের দাবি মুসলমান সমাজ হইতেই উঠিয়াছিল। মুসলমান মহিলাদের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়াই সুপ্রিম কোর্ট তাৎক্ষণিক তিন তালাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। আয়াপ্পা গোষ্ঠীর ভিতর হইতে শবরীমালা মন্দিরে ঋতুযোগ্য মহিলাদের প্রবেশের দাবি ওঠে নাই। যাঁহারা এই দাবি তুলিয়াছেন, তাঁহারা আয়াপ্পা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন না। শুধু আয়াপ্পা গোষ্ঠী কেন, হিন্দু সমাজের কোনও অংশেরই প্রতিনিধিত্ব তাঁহারা করেন না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন এবং কিছু সংশয়ের উদ্রেক এই ক্ষেত্রে হইতেছে। প্রথমত, ভারতবর্ষে বহু প্রখ্যাত মসজিদেই মহিলাদের প্রবেশাধিকার নাই। যাঁহারা আয়াপ্পা মন্দির লইয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইয়াছেন, মসজিদের প্রসঙ্গে তাঁহারা নীরব কেন? তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধকরণের বিষয়েই বা তাঁহারা নিশ্চুপ কেন? দ্বিতীয়ত, শবরীমালায় এই আয়াপ্পা মন্দিরটি দীর্ঘদিন হইতেই খ্রিস্টান মিশনারিদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। পঞ্চাশের দশকে এই মন্দিরটিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া ধ্বংস করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল খ্রিস্টান মিশনারিরা। ফলে সংশয় জাগে, নারীর অধিকার রক্ষার নাম করিয়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আবারও আয়াপ্পা মন্দিরকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় নাই তো?

বলিতেই হয়, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে আয়াপ্পা গোষ্ঠীর মতামতকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের আবেগে আঘাত করা হইয়াছে। একটি গোষ্ঠীর ধর্মীয় আবেগকে এইভাবে পদদলিত করা কি সঠিক বিচার? আশা করি, দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাহা আর একবার বিবেচনা করিবেন।

সুভাষিতম্

পুণ্যং প্রজ্ঞা বর্ধয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ।

বৃদ্ধ প্রজ্ঞঃ পুণ্যমেব নিত্যমারভতে নরঃ।। (বিদুর নীতি)

বার বার পুণ্যকর্মের ফলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। যাঁর বিবেক-বুদ্ধি বেড়ে চলে তিনি সর্বদা পুণ্যই করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ

ডাঃ মদন লাল চৌধুরী

বুদ্ধিজীবী বলতে বিদ্বজ্জনদের বোঝায়। এঁরা সৎ এবং নিরপেক্ষ হবেন আশা করা যায়। কারণ দেশবাসীর উন্নয়নে এঁদের মতামত বিশেষ গুরুত্ব পায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক জগতের লোকরাই বুদ্ধিজীবী বলে প্রচার পাচ্ছেন। কিন্তু নিজেদের আখের গোছাতে এদের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞাটাই পাল্টে দিয়েছে।

স্বার্থান্বেষী এই বুদ্ধিজীবীদের মুখোশের আড়ালে বাকস্বাধীনতা, কবির স্বাধীনতা, শিল্পীর স্বাধীনতা তা সে যতই কুরুচিকর হোক না কেন তার অজুহাতে যা খুশি বলতে পারা বা দেখানোর স্পর্ধা এক ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। যার ফলশ্রুতি মকবুল ফিদা হোসেনের দেবী সরস্বতীর নগ্ন ছবি আঁকা, দেবী দুর্গাকে যৌনকর্মীরূপে প্রচার এবং ভারতের বুকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'ভারত কী বরবাদিতক জঙ্গ চলেগা' ইত্যাদি স্লোগান এবং জাতীয় সঙ্গীতকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দিয়ে স্বাধীনতা দিবসে গাওয়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি এবং বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ করতে নিষেধাজ্ঞা।

সরকারের দেওয়া ভূষণের ভাণ্ডারে যাতে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সেজন্য এই বুদ্ধিজীবীরা মুসলমান তোষণে মেতেছে। তাই এরা চুপ ছিলেন হাওড়ার ধুলাগড় ও ক্যানিংয়ের নলিয়াখালিতে যেখানে পরিকল্পিত ভাবে হিন্দুদের আক্রমণ করা হয়েছিল। এরা চুপ থাকেন বাংলাদেশে হাজার হাজার হিন্দুরমণী ধর্ষিতা হলে এবং চার লাখ হিন্দু পণ্ডিত নিজের বাসভূমি ছেড়ে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হলে। গোধরা কাণ্ডে যখন গরিব, নিষ্পাপ, ধর্মপরায়ণ হিন্দু নর-নারীকে ট্রেনের মধ্যেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় তখনও এরা চুপ ছিলেন, কিন্তু সোচ্চার হয়েছিলেন পাল্টা প্রতিরোধের সময়ে।

এরা হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাই ঘটা করে চৌরঙ্গীতে গোমাংস খান। কিন্তু রাজাবাজারে গিয়ে শুয়োরের মাংস খাওয়ার সাহস করেন না। এদের একজন তো হিন্দু ধর্মের প্রতীক ত্রিশূলে কনডোম পরানোর দুঃসাহসও করেছেন। আর এখন এদের একজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তুষ্ট করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে মহিষাসুর বানিয়ে দুর্গাপুজোর থিম সং করেছে। এদের বিবেক জাগ্রত হয় না যখন বাংলাদেশে কমবয়সী মেয়ে-বউদের মুসলমানরা তুলে নিয়ে যায় এবং দু-তিন দিন পরে ফেরত দেয়। বর্তমানে বাংলাদেশি হিন্দু তরুণীদের আরাধ্য দেবতার নিকট একটাই প্রার্থনা তাঁকে যেন ধর্ষিতা না হতে হয়। হতভাগ্য হিন্দু নারীরা বাংলাদেশে যখন নির্মম, পৈশাচিক, অসহায় ভোগের বস্তুতে পরিণত হচ্ছে তারপরেও এই বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রবেশের পক্ষে সওয়াল এক লজ্জাজনক ঘটনা। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এরা বুদ্ধিজীবী না বুদ্ধিহীন পরজীবী?

নিজেদের হাতে সকলেই সাড়ে তিনহাত কিন্তু এরা নিজেদেরকে কম করেও সাত হাত ভাবে। মোদীজী যখন প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন তখন এরা এমনকী একজন নোবেল লরিয়েটও দেশটা গেল গেল রব তুলে সোচ্চার হয়েছিলেন, অথচ মানবকল্যাণে মোদীজীর সমকক্ষ নেতা ভারতবর্ষে তো নেইই, সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

যেদিন মুখ্যমন্ত্রীরূপে যোগীজী উত্তরপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন সেদিন উত্তরপ্রদেশে একসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানরা মিষ্টি বিলি করল, রাস্তায় বাজি ফাটাল এবং বাজনা বাজিয়ে নাচতে নাচতে শোভাযাত্রাও বের করল। যোগীজীকে কট্টর হিন্দুত্বের মুখ বলেই বেশিরভাগ লোক জানে কিন্তু ক'জন জানে গোরখপুর মন্দিরের রন্ধনশালার দায়িত্বে রয়েছেন একজন মুসলমান মহিলা, নাম হামিদা বেগম? ক'জন জানেন মন্দিরের ৪০০টি গোরুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে একজন মুসলমান, নাম জান মহম্মদ? এবং আর এস এস? এ হলো একশো শতাংশ অরাজনৈতিক এক জাতীয় সংগঠন যা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উন্নয়নে নিয়োজিত। আর এস এস-কে মুসলমান বিরোধী প্রচার তো মুসলমান ভোট করায়ত্ত করতে। আর এস এস তো মোদীজীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ আদর্শে ভারতীয় মুসলমানদের মূলস্রোতে আনতে চায়। অথচ বিদ্বজ্জনের ভেক ধরে এই বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতি করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি আবেগকে খুঁচিয়ে মোদীজী, আর এস এস এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লোক খেপাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এরা ভুলে যাচ্ছেন, ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য আমরা সকলেই আজ পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক, উদ্বাস্তু নই। আর কত বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেবেন পশ্চিমবঙ্গের এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা?

ভারতবর্ষ যখন এক সমৃদ্ধ ও শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে তখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি এবং মোদীজীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছে, তখন এই বুদ্ধিজীবীরা মিথ্যে কথার ফুলঝুরি এবং মোদী হঠাও পরিকল্পনার সুরে সুর মিলিয়েছেন। এদের জন্য বুদ্ধিজীবী শব্দটাই এখন একটা গালাগালিতে পরিণত হয়েছে। ■

দিদি আপনিই দেবী

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা

সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা। দুর্গা পুজো শেষ হলো। কিন্তু পুজো দেখে আজকাল বোঝা যায় না পুজোটা কার? সব নিবেদনই যেন দিদির জন্য। দিদি আসলে এমন এক দেবী যিনি পুজোর আগেই প্রসাদ দেন। শুধু কী তাই? পুজোর দক্ষিণা নিজেই দিয়ে দেন। মানে দেওয়া শুরু করলেন। ফলে পুজোও বেড়ে গিয়েছে। সবাই তাঁর পুজোতেই মত্ত। পুজোর তখনও ঢের দেরি। তখন থেকেই কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় একটা হোর্ডিং দেখা গিয়েছে, ‘বিশ্বজননীর চক্ষু দান করছেন বঙ্গজননী’। দুর্গাপ্রতিমার চোখ আঁকছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কে যেন বলছিল পুজো আসলে তেল মারার প্রতিযোগিতা। সেটা আবার কলকাতায় মারাত্মক। আসলে সব পুজোই তো দিদির ভায়েদের। তেল ছাড়া কিছুই যে দেওয়ার নেই তাঁদের। এক্ষেত্রে প্রশ্নটা যখন প্রতিযোগিতার, সে প্রতিযোগিতার পথ বড়ই পিচ্ছিল এবং তৈলাক্ত। এবং কে না জানে, তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদর দু'কদম ওঠে, তো তিন কদম নেমেও যায়। তবু সেই পথেই বিস্তর আনাগোনা এখন। এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রাঙ্গণ জুড়ে সেই ভজন-বন্দন-কীর্তনেরই প্রতিযোগিতা। অতএব, দুর্গার ভজনা-বন্দনাকে বেশ দেখনদারি করতে পারলে বেশ খানিকটা লম্বা রেসের প্রস্তুতি নেওয়া যায়। আরে বাবা পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা ভোটের টিকিট তো এই দেবীই দেন দুর্গা আর কী করবেন।

তবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুধুমাত্র দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর বন্দনাকে যে পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন বেশ কিছু পুজো উদ্যোক্তা, তাতে বোধহয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিঞ্চিৎ লজ্জা পেয়ে থাকতে পারেন। অবশ্য তেল নামক উপকরণকে তিনি ভালোবাসেন। তাই লজ্জা নাও হয়ে থাকতে পারে।

সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে নদীয়া জেলার একটি পুজো। সেখানে পুজোর প্রাঙ্গণ জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানান মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিভিন্ন মূর্তি রূপেই। সেলফি জোনও তৈরি করা হয়েছে ওই মূর্তির সামনে।

মণ্ডপে করজোড়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী তথা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অবয়বে যেন একটু রোগা। মোবাইল বাগিয়ে তাঁর সঙ্গে নিজস্বী তুলতে গিয়ে দর্শনার্থীরা দেখেছেন, মহাসচিব একা নন। যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অদূরে। সেলফি তোলার সুযোগ অবাধ। সেই সেলফি ঘুরছে ফেসবুক জুড়ে।

ঠিকানাটা জেনে সেখানে গিয়েছিলাম একদিন। নদীয়ার চাকদহ রেলস্টেশনের পূর্ব পারে, কে বি এম মোড়ে। ‘প্রান্তিক’-এর দুর্গাপুজোর আসরে সেখানে হাজির ফাইবারের মমতা, পার্থ, অভিষেক। রয়েছে সেলফি জোন। গিয়ে শুনি, নিজস্বী তুলে জমিয়ে ক্যাপশন করে উদ্যোক্তাদের কাছে জমা দিয়ে বিচারকমণ্ডলীর মন পেলে পুরস্কারও জুটে যেতে পারে।

শুধু নদীয়াই বা কেন? কলকাতার মধ্যে খিদিরপুর ৭৪পল্লির পুজোতেও মডেল রূপে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম। শুনেছি পুজো উদ্বোধনে গিয়ে দু'জনেই নিজেদের মূর্তি দেখেছেন এবং শিল্পকর্মে পুলকিত হয়েছেন।

আর দিদির পুলক কতটা ছিল বোঝা যায়নি। আসলে তিনি বেতন কমিশন, ডিএ, মাঝেরহাট, স্বপ্নের জোট এসব নিয়ে এতটাই ঘেঁটে ...

—**সুন্দর মৌলিক**

অতিথি কলম

আধুনিক ভারতের প্রথম রূপকার

নরেন্দ্র মোদী

১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধটি ভারত ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উপনিবেশিক শাসনের অবসান যে হতে চলেছে এটা যেমন তখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তেমনি ঠিক হয়ে গিয়েছিল দেশভাগ। কিন্তু একটা বিষয় তখনও নিশ্চিত ছিল না যে দেশ ভাগ হলে তা কি একাধিক হবে? দেশের অভ্যন্তরে জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছিল, খাদ্যাভাব হয়ে উঠছিল প্রকট। কিন্তু এসবকে ছাপিয়ে উঠছিল ভারতের একতাকে অটুট রাখার চাপ।

এই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখেই ৪৭-এর জুন মাসে তৈরি হলো স্টেটস ডিপার্টমেন্ট। এই নতুন দপ্তরটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেই সময় দেশের মধ্যেকার ৫৫০টি ছোটো ছোটো স্বাধীন রাজ্যকে সামলানো। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের সঙ্গে আলোচনা চালানো ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ওপর। এই অঙ্গরাজ্যগুলি আয়তনে, জনসংখ্যায়, স্থানিক বৈশিষ্ট্যে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ছিল একে অপরের থেকে আলাদা। এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন "The problem of the states is so difficult that you alone can solve it." কথাটি প্যাটেলের উদ্দেশে। একেবারেই স্বকীয় স্টাইলে সর্দার প্যাটেল তিনি তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর অস্ত্র ছিল কাজে নিপুণতা, দৃঢ়তা ও সর্বোপরি প্রশাসনিক দক্ষতা। বাস্তবে তাঁর হাতে সময় ছিল কম কিন্তু কাজ ছিল পাহাড়প্রমাণ। কিন্তু হায়! লোকটি তো আর রাম শ্যাম নন, তিনি সর্দার প্যাটেল। তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন কোনও অবস্থাতেই জাতিকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবেন না। তিনি ও তাঁর দপ্তরের মধ্যস্থতাকারীরা একের পর এক রাজন্যবর্গের সঙ্গে সফল আলোচনা চালিয়ে সমস্ত স্বাধীন রাজ্যকেই ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করতে রাজি করালেন। তারা সকলেই স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দিল। হ্যাঁ, আজকের ভারতের যে মানচিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি তার পেছনে রয়েছে সর্দার প্যাটেলের দিবারাত্র নিরলস প্রচেষ্টার ফল।

স্বাধীনতা হাতে আসার পরে পরেই তৎকালীন দক্ষ আমলা ভিপি মেনন তাঁর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সর্দার প্যাটেল তাঁকে নিরস্ত করে বুঝিয়েছিলেন যে সময়টা বিশ্রাম নেওয়ার তো নয়ই— অবসর নেওয়ার পক্ষেও উপযুক্ত নয়। এমনই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা। ভিপি মেননকে স্টেটস ডিপার্টমেন্টের সচিব করা হয়। মেনন পরবর্তীকালে তাঁর 'The story of the integration of India' গ্রন্থে জানিয়েছেন সর্দার প্যাটেল কীভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে সকলকে উজ্জীবিত শুধু নয়, সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে কাজ করার প্রেরণা দিতেন। মেনন আরও লিখেছেন প্যাটেলের কাছে সর্বাগ্রে ছিল ভারতবাসীর স্বার্থ। এক্ষেত্রে তিনি কোনও আপোশে প্রস্তুত ছিলেন না।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের প্রত্যুষে আমরা আমাদের নতুন ভবিষ্যতের সূচনাকে উদ্‌যাপন করছিলাম। কিন্তু আমাদের জাতি গঠনের কাজ তখনও বহুলাংশে অসম্পূর্ণ ছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনিই নির্মাণ করে দেন সফলভাবে প্রশাসন চালাবার প্রথা প্রকরণ। তার মধ্যে প্রশাসনের দৈনন্দিন রুটিন কাজকর্ম চালানোর পদ্ধতি যেমন ছিল, তেমনিই দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্রতম ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য কাজের নির্দিষ্ট নির্দেশও ছিল।

সর্দার প্যাটেল ছিলেন একজন পোক্ত প্রশাসক। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা— বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে (১৯২০) যখন তিনি আমেদাবাদ মিউনিসিপালটির প্রশাসনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তা এই সময় খুব কাজে এসেছিল। আমেদাবাদে প্রশাসক থাকাকালীন শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। শহরব্যাপী তিনি একটি সচল নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। শহরাঞ্চলে বিদ্যুতায়ন, রাস্তা, শিক্ষা ও সামগ্রিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপরই তাঁর কড়া নজর ছিল।

শুধু তাই নয়, আজকের ভারত যদি একটি বেগবান সমবায় ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে গর্ব করতে পারে তার সিংহভাগ কৃতিত্বই দিতে হবে সর্দার প্যাটেলকে। আজকের 'আমুল' নামের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের যে মহীরুহ আমরা প্রত্যক্ষ করি তার মূল রয়েছে সর্দারের স্থানীয় মানুষের ক্ষমতায়নের চিন্তা ভাবনায়। বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেওয়ায়। সমবায়ের মাধ্যমে বাসস্থান গড়ে তোলার ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। নিজের বাসস্থান যে মর্যাদার প্রতীক, এও তাঁরই ভাবনা।

দুটি চারিত্রিক গুণের সমার্থক ছিলেন তিনি, তা হলো বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংহতি। দেশের কৃষক সমাজের অবিমিশ্র

বিশ্বাস ছিল তাঁর ওপর। থাকারই কথা। আদতে তিনি তো ছিলেন একজন কৃষক পরিবারের সন্তান যিনি বরদলৌ সত্যাগ্রহের সময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেশের খেটে খাওয়া মানুষ সর্বদাই তাঁর মধ্যে আশার আলো দেখে এসেছে। তারা বিশ্বাস করত তিনিই একমাত্র লোক যে তাদের কথা বলবে। ব্যবসাদার ও শিল্পপতিরাও তাঁর সঙ্গে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন, কেননা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামগ্রিক শিল্পায়নের দূরদৃষ্টি এই পুরোধা পুরুষটির মধ্যেই বিদ্যমান, এমনটাই ছিল তাদের আস্থা।

বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাঁকে পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। আচার্য কৃপালনী স্বীকার করে গেছেন, যদি এমন হতো যে, গান্ধীজীকে পাওয়ার উপায় নেই অথচ একটা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছে সেক্ষেত্রে তাঁরা সাহায্যের জন্য সর্দারের কাছেই ছুটে যেতেন। এই সূত্রে, ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক, দ্বিপাক্ষিক ও বহুমুখী আলোচনা যখন তুঙ্গে তখন কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'The man of decission and man of action।' আসলে সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করত শুধু নয়, তাঁর কথা ও কাজের ওপর ভরসা রাখত। ভারতের জাতি, বর্ণ, ধর্ম, বয়স নির্বিশেষে সকলেই সর্দারকে সম্মান করত।

এই বছর সর্দারের জন্মদিনটি আরও বেশি মর্যাদায় পালিত হতে চলেছে। ১৩০ কোটি ভারতবাসীর আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর স্মৃতিতেই 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি' উন্মোচিত হচ্ছে। নর্মদা নদীর তীরে তাঁর এই প্রতিমূর্তি বিশ্বের মধ্যে উচ্চতম মূর্তির গরিমার দাবিদার। 'ভূমিপুত্র' সর্দার প্যাটেলের গগনচুম্বী এই প্রতিরূপ সর্বদা আমাদের পথনির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে অনুপ্রেরণারও উৎসস্থল হয়ে থাকবে।

আমি সেই সমস্ত কর্মীকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই যাঁরা দিনরাত এক করে সর্দার প্যাটেলের এই বিশাল প্রতিমূর্তিকে যথাসময়ে নির্মাণ করে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চিহ্নকে বাস্তব করে তুলেছেন। আজ আমার মন আবেগতাড়িত হয়ে ফিরে যাচ্ছে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে, যখন আমরা এই বিশাল কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। আজ অল্প সময়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় ভারতীয় হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই গর্ব হওয়া উচিত। আগামীদিনে আপনারা সকলে এই স্ট্যাচু অব ইউনিটি দর্শন করুন এই আমার অনুরোধ।

জাতীয় একতার এই প্রতিমূর্তি বাস্তবে আমাদের হৃদয়ের একতারও স্মারক। আমাদের মাতৃভূমির ভৌগোলিক সংহতির একটি রূপক। এটি আমাদের স্মরণ করায় যে, নিজেদের মধ্যে বিভেদ রেখে চললে আমরা হয়তো পরস্পরের সঙ্গে মিলতেই পারব না। একত্রিত হয়ে থাকলে গোটা বিশ্বের মোকাবিলায় আমরা পরম শক্তিধর হয়ে উন্নতি ও গৌরবের নতুন সোপানে উঠতে সক্ষম হব।

ভাবলে অবাক হতে হবে যে, সর্দার প্যাটেল কী বিদ্যুদ্‌গতিতে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসকে চুরমার করে গড়ে তুলেছিলেন একটি নতুন জাতির ভৌগোলিক সংহতি যার মূলে ছিল জাতীয়তাবোধের বীজমন্ত্র।

“জাতীয় একতার এই প্রতিমূর্তি বাস্তবে আমাদের হৃদয়ের একতারও স্মারক। আমাদের মাতৃভূমির ভৌগোলিক সংহতির একটি রূপক। এটি আমাদের স্মরণ করায় যে, নিজেদের মধ্যে বিভেদ রেখে চললে আমরা হয়তো পরস্পরের সঙ্গে মিলতেই পারব না। একত্রিত হয়ে থাকলে গোটা বিশ্বের মোকাবিলায় আমরা পরম শক্তিধর হয়ে উন্নতি ও গৌরবের নতুন সোপানে উঠতে সক্ষম হব।”

রম্যরচনা

যমদূত এসেছে পল্টুর কাছে। পল্টুকে নিয়ে যাবে।

যমদূত— চল পল্টু। তোর ডাক এসে গেছে।

পল্টু— কিন্তু যমদূত, এত তাড়াতাড়ি আমি যাব কেন? আমার তো যাওয়ার বয়সই হয়নি।

যমদূত— সে আমি কী জানি। নিয়ে যাওয়ার লিস্টে প্রথমেই তোর নামটা রয়েছে।

পল্টু লিস্ট দেখল। সত্যিই তার নাম এক নম্বরে। হতাশ হয়ে যমদূতকে বলল— তা নিতে যখন এসেছেনই, বসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান অন্তত।

পল্টু ভালো করে চা বানালো। চায়ে ঘুমের ওষুধও মিশিয়ে দিল। ঘুমের ওষুধ মেশানো চা খেয়ে যমদূত তো ঘুমিয়ে কাদা। এদিকে পল্টু চুপিসাড়ে লিস্টের প্রথমে তার নামটা কেটে একেবারে শেষে লিখে দিল।

অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙল যমদূতের। ঘুম ভেঙে যমদূতের মেজাজ খাসা। বলল— ওহ, যা একখানা দারুণ চা বানিয়েছিলি না। খেয়ে দারুণ ঘুম হলো। আমি এখন তোর কথাই রাখব। লিস্টের শেষ থেকেই লোক ধরে নিয়ে যাব।

উবাচ

" আর্টিকেল ৩৭৭, জালিকাট্টু, শবরীমালা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অল্প সময়ের মধ্যে রায়দান করেছে। অথচ রামমন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত মামলাকে কয়েক দশকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। "

রাকেশ সিন্হা
রাজ্যসভার সাংসদ

সুপ্রিম কোর্টের রামমন্দির রায় দান সম্পর্কে এক টুইটবার্তায়

" বিশ্ব ব্যাঙ্কের তালিকায় এক ধাক্কায় ২৩ ধাপ উঠে ৭৭ নম্বরে চলে এসেছে ভারত। আর এক বছরের মধ্যেই তালিকার প্রথম পঞ্চাশে ঢুকে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের। মোদী সরকারের প্রথম চার বছরেই ৬৫ ধাপ উঠে এসেছে দেশ। "

অমিতাভ কান্ত
নীতি আয়োগের সিইও

ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্য প্রসঙ্গে

" সুবিধাবাদীদের প্ররোচনামূলক মন্তব্যের জন্যই অসমের ধলার খেরবাড়ি অঞ্চলের বিছনিমুখ গ্রামের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। "

কেশব মহন্ত
অসমের মন্ত্রী

অসমে পাঁচজন বাঙ্গালি হত্যা প্রসঙ্গে

" কোটি কোটি হিন্দুর আবেগ যার সঙ্গে জড়িয়ে সেই রামমন্দির সুপ্রিম কোর্টের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। "

সুরেশ যোশী
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ

রামমন্দির মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় প্রসঙ্গে

রামমন্দির কংগ্রেসের কাছে শাঁখের করাত

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

অযোধ্যায় রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার শুনানির দিনক্ষণ আবার পিছিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৯ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ সম্বন্ধে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেছেন, ২০১৯-এর জানুয়ারি মাসে ঠিক হবে, রামমন্দির মামলার শুনানি কবে থেকে শুরু হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এই বক্তব্যেই পরিষ্কার— রামমন্দির মামলাটি আবার বিশবাঁও জলের তলায় ফেলে দেওয়া হলো। আরও পরিষ্কার--- ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কোনোমতেই এই মামলাটির ভাগ্য নির্ধারিত হবে না। সুপ্রিম কোর্টের এহেন রায়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি হয়েছে কংগ্রেস। কারণ, কংগ্রেসের বরাবরই আশঙ্কা ছিল, এই মামলার রায় যদি রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে যায়, তাহলে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মোকাবিলা করা কংগ্রেসের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। এই আশঙ্কা থেকেই এর আগে আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন, রামমন্দির মামলার শুনানি যেন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরেই শুরু করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র কংগ্রেস নেতার এই আবেদনে গুরুত্ব না দিলেও, বর্তমান প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন— তাতে অবশ্য কপিল সিব্বলের দাবিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রামমন্দির সংক্রান্ত মামলার শুনানিটি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে একটি কারণও দেখিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি বলেছেন--- রামমন্দির মামলাটি তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই। কাজেই সুপ্রিম কোর্ট তাদের সময়-সুযোগ মতো মামলাটি শুরু করবে। অথচ এর আগে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তাঁর নির্দেশে পরিষ্কার বলে গিয়েছিলেন, ২৯ অক্টোবর থেকেই রামমন্দির মামলার শুনানি হবে। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তে অবশ্য তাঁর পূর্বজের নির্দেশটিকে কার্যত অস্বীকারই করা হলো। এর আগে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের সিদ্ধান্তে দেশের এক বড়ো অংশের মানুষ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন, বিগত সাত দশক ধরে ঝুলে থাকা এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির এবার হয়তো দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের হতাশ এবং ক্ষুব্ধ করেছে।

সুপ্রিম কোর্ট কী ধরনের বিচার-বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিল— তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে যাচ্ছি না। কিন্তু এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু প্রশ্ন সামনে উঠে আসবেই। সেই প্রশ্নগুলির নিয়ে চর্চা হওয়া অতীব জরুরি। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, অযোধ্যার রামমন্দিরের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসমাজের আবেগ জড়িত। যার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগ জড়িত— তাকে অগ্রাধিকার না দেওয়াটা বোধহয় যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ প্রস্তাবিত রামমন্দিরের স্থলে খননকার্য চালিয়ে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। ফলত, ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেই ওখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যকে মান্যতা দেওয়ার জন্যই আদালতের রায়ের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন অনেকেই। তৃতীয়ত, রামমন্দির সংক্রান্ত মামলাটির ভাগ্য গত প্রায় সত্তর বছর ধরে ঝুলে রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন, দ্রুত এই মামলার শুনানি হোক। প্রধান বিচারপতি তার আর্জি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছেন, এই মামলার শুনানি জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি না মার্চ— কোন মাসে শুরু হবে, তা ঠিক করবে সুপ্রিম কোর্ট। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে মামলাটির সঙ্গে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আবেগ জড়িত এবং যে মামলাটি সম্পর্কে গত সাত দশকেও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি— তাকে এবারও কেন অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা গেল না? শবরীমালা মন্দিরের ক্ষেত্রে যদি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রায় দেওয়া যায়— তাহলে রামমন্দিরের ক্ষেত্রে অসুবিধাটা

কংগ্রেস কিন্তু এখন উভয় সংকটে। শুধু কংগ্রেস সংকটে বললে ভুল হবে। বিজেপি বিরোধী সব দলেরই এখন শাঁখের করাতের অবস্থা। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেও বিপদ। আবার বিজেপি অধ্যাদেশ আনলে তার বিরোধিতা করলেও বিপদ।

কোথায়? সুপ্রিম কোর্টের এমন একটি সিদ্ধান্তের ফলে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনে হতেই পারে, তাদের ধর্মীয় আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া তো হচ্ছেই না, উপরন্তু সেই আবেগকে আঘাত করার প্রচেষ্টাও যেন দেখা যাচ্ছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভিতর এই ধারণা জন্ম নিলে তা থেকে ক্রমে ক্ষোভ এবং পরে তা আগুনে পরিণত হলে তার দায় নেবে কে? সুপ্রিম কোর্ট কী সিদ্ধান্ত নেবে— তা তার এক্তিয়ারেই পড়ে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাকে গ্রহণযোগ্য যুক্তি তো পেশ করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও বলতে হচ্ছে— রামমন্দির মামলায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু কোনও গ্রহণযোগ্য যুক্তি দেখাতে পারেনি।

এবার আসা যাক রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের প্রশ্নটিতে। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ মূলত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যক্রম। সঙ্ঘ পরিবার এবং বিজেপি তাতে সহভাগী হয়েছে। রামমন্দিরের আবেগ বিজেপির উত্থানে সহায়ক হয়েছে— একথাও অস্বীকার করা যায় না। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির ভিতর অন্যতম ছিল অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে মামলার রায় যদি রামমন্দিরের পক্ষে যেত তাহলে অবশ্যই রাজনৈতিক ভাবে বিজেপির বড়ো লাভ হতো। সুপ্রিম কোর্টের রায় রামমন্দিরের পক্ষে যাবে— এমন একটি আশায় বিজেপি বুকও বেঁধেছিল। কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়ালো তাতে বোঝাই যাচ্ছে— সুপ্রিম কোর্টের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলে মন্দির নির্মাণ কবে হবে বলা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট কবে এই মামলার শুনানি শুরু করবে— জানুয়ারি না মার্চে— তার জন্য অপেক্ষা করাও বোধহয় বিজেপির পক্ষে সমীচীন হবে না। ইতিমধ্যেই অযোধ্যায় এমন বক্তব্য শোনা গিয়েছে— 'আমরা সুপ্রিম কোর্টকে ভোট দিইনি। ভোট দিয়েছি নরেন্দ্র মোদীকে।' সাধু-সন্তরাও বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে সরকারকে আইন করে রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি অলোক কুমার বলেছেন, ''সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই আইন এনে রামমন্দির নির্মাণ করতে হবে। এমন আইন বানাতে হবে যা সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হলেও সরকার দক্ষতার সঙ্গে সওয়াল করতে পারে।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে— 'অযোধ্যায় রামের জন্মস্থান, এটা আদালতে সিদ্ধ। শুধু জমি চাই। সরকার আইন করে জমি রাম জন্মভূমি ন্যাসের হাতে তুলে দিক। মন্দির হলেই দেশে সদ্ভাবনার পরিবেশ তৈরি হবে।' হিন্দুদের এই আবেগের জায়গাটি বিজেপি কখনই উপেক্ষা করতে পারে না। উপেক্ষা করা উচিতও নয়। উপরন্তু ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করার দায়ও তার রয়েছে। এইরকম পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের সামনে একটিই পথ খোলা। তা হচ্ছে, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে অধ্যাদেশ জারি করে রামজন্মভূমি জমি অধিগ্রহণ করে তা রাম জন্মভূমি ন্যাসের হাতে তুলে দেওয়া।

অন্যদিকে কংগ্রেস। রাম মন্দির প্রসঙ্গটি কার্যত কংগ্রেসের শাঁখের করাত। এটি কংগ্রেসকে যেতে কাটবে, আসতেও। কংগ্রেস নেতৃত্ব ভেবেছিলেন এবং এখনও ভাবছেন যে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সুপ্রিম কোর্টে রামমন্দির সংক্রান্ত শুনানি আটকে দিলেই বুঝি বিজেপির মোকাবিলা করা যাবে। এই উদ্দেশ্যেই কপিল সিব্বাল ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরে রামমন্দির মামলার শুনানি শুরু করার দাবি তুলেছিলেন। এখন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরে কংগ্রেস মহলে খুশির হাওয়া বইছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যাবে— এতে কংগ্রেসের আনন্দিত হওয়ার কিছুই নেই। রামমন্দির কোনওভাবেই কংগ্রেসকে কোনও সুবিধা এনে দেবে না। এমনিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটার কংগ্রেসকে রামমন্দির নির্মাণের বিরোধী হিসাবেই চেনে। রামমন্দির মামলার শুনানি পিছাতে চেয়ে কপিল সিব্বালের আচরণও তারা ভালোভাবে নেয়নি। ফলে, এখন যদি সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কংগ্রেস উল্লাস প্রকাশ করে, তাহলে হিন্দু ভোটাররা কংগ্রেসের প্রতি বিমুখই হবে। পাঁচ রাজ্য বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে এবং ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহারের মতো রাজ্যে কংগ্রেসকে তার মাশুল গুনতেও হতে পারে। আবার অন্যদিকটা ভাবা যাক। যদি বিজেপি সরকার অধ্যাদেশ জারি করে রামমন্দিরের জমি অধিগ্রহণ করে এবং তারপর ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগেই রামমন্দির নির্মাণের কাজে এগোয়— তখন কংগ্রেস কী করবে? হিন্দু ভোট যে কংগ্রেসের প্রতি বিমুখ সেটা বুঝেই কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এখন মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিজেকে পৈতেধারী শৈব বলেও ঘোষণা করেছেন। কাজেই অধ্যাদেশ জারি করে বিজেপি সরকার রামজন্মভূমির জমি অধিগ্রহণ করলে তার বিরোধিতা করা কংগ্রেসের পক্ষে সহজ হবে না। বিরোধিতা করলে হিন্দুভোট কংগ্রেসকে চিরতরে ত্যাগ করবে। ফলত, ওপর ওপর যাই মনে হোক— কংগ্রেস কিন্তু এখন উভয় সংকটে। শুধু কংগ্রেস সংকটে বললে ভুল হবে। বিজেপি বিরোধী সব দলেরই এখন শাঁখের করাতের অবস্থা। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেও বিপদ। আবার বিজেপি অধ্যাদেশ আনলে তার বিরোধিতা করলেও বিপদ। ফলে, মায়াবতী, মমতা, অখিলেশরা আপাতত মুখে কুলুপ এঁটেছেন। আর এই পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে, ২০১৯-এ রামলালাই টেনে নিয়ে যাবেন বিজেপির বিজয় রথ।

একটি শুধু মাস্টারস্ট্রোক দরকার বিজেপির। তা হলো অধ্যাদেশ জারি করে রামমন্দিরের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা। তখনই প্রমাণ হয়ে যাবে পৈতেধারী রাহুল গান্ধী সত্যই হিন্দু, না, ইতালিয়ান ক্যাথলিক।

স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার স্বরূপ

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

প্রতি বছর মহা উৎসাহে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। পালিত হয় নানা ধরনের কর্মসূচি। অনেক বাড়ির ছাদে বা অলিন্দে ঝোলে জাতীয় পতাকা।

আমাদের মনে কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন জাগে— আমরা কেমন স্বাধীনতা পেয়েছি? তার স্বরূপ কী। কয়জন পেয়েছেন স্বাধীনতা? এর বাস্তব মূল্য কী?

এটা ঠিক যে, দুশো বছর স্বৈর-শাসনের পর ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ওই তারিখে বিদায় নিয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে আমাদের দেশীয় নেতাদের কাছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বরূপ কী?

অবশ্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীদের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল। বন্দে মাতরম্, সন্ধ্যা, যুগান্তর, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকাও জাগিয়ে তুলেছিল স্বদেশবোধ। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বম্বে অ্যাসোসিয়েশান, পুণা সার্বজনীন সভা প্রভৃতি সংস্থাও সেই বোধকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

কিন্তু ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের ফলে সারা দেশে জাতীয় চেতনা আরও বেশি করে প্রসারিত হয়েছিল। প্রায় সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল দেশাত্মবোধ। কিন্তু তখনও 'স্বাধীনতা'-র ধারণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কংগ্রেসের মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, দাদাভাই নৌরজী, গোখেল প্রমুখ নেতা ব্রিটিশ-শাসনের অবসানের কথা চিন্তাই করতে পারেননি— তাঁদের লক্ষ্য ছিল 'স্বরাজ', অর্থাৎ ব্রিটিশ- সাম্রাজ্যের ভেতরেই কিছুটা স্বায়ত্তশাসন। আর তাঁরা নির্ভর করেছেন শাসকদের সহৃদয়তা ও সহানুভূতির ওপরেই।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫) পর চরমপন্থীরাই প্রথমে 'স্বাধীনতা' কথাটা উচ্চারণ করেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) প্রমুখ নেতা স্পষ্ট করেই ব্রিটিশের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তুলেছেন এবং তার জন্য উপযুক্ত ও সক্রিয় পন্থা গ্রহণের কথাও বলেছেন। ফলে তাঁরা বহিষ্কৃতও হয়েছেন। ড. পি. এন. চোপ্রার ভাষায়— 'The Extremists who stood for Purna Swaraj or complete independence were excluded from the party'— (ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল্ ফর ফ্রিডম, পৃ. ২০)। পরে লক্ষ্ণৌতে তাঁদের পুনর্মিলন ঘটলেও লক্ষ্যটা অস্পষ্টই থেকে গেছে।

১৯২১ সালে গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক হয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন, তিনি তখন আবার ফিরিয়ে এনেছেন 'স্বরাজ-তত্ত্ব'— 'স্বাধীনতা' তাঁর লক্ষ্যই ছিল না। তাঁর দাবি ছিল— 'Inside the Empire, if possible– outside it, if necessary।' অবশ্য তাঁর তত্ত্ব না বুঝেই সারা দেশ উদ্বেল-উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ঘরের বাইরে নেমে এসেছিলেন এক অভূতপূর্ব আবেগ উল্লাসে। বন্দির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬০ হাজার। কিন্তু সেটা 'স্বাধীনতা'-র সংগ্রামই ছিল না, কারণ সেই সংগ্রাম হয় আপোশহীন, চূড়ান্ত ও মৃত্যুত্তীর্ণ। উত্তরপ্রদেশের একটা বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনায় তিনি হঠাৎ সেই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বার বার গান্ধীজীকে বলেছিলেন— আন্দোলন শুরু করার জন্য। তাঁর মতে, সংগ্রাম শুরু করলেই সারা দেশ মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে— সাম্প্রদায়িক চিন্তা ধামাচাপা পড়বে। কিন্তু গান্ধীজী জানিয়েছেন, তিনি আলো দেখতে পাচ্ছেন না।

আশায় উদ্বেল মানুষ তখন হঠাৎ হতাশায় ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। ড. নিমাইসাধন বসু মন্তব্য করেছেন, 'Gandhij's decision caused great disappointent'— (দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ. ৮১)। তাঁর কাছে স্বাধীনতা নয়— বড়ো ছিল অহিংসা তত্ত্ব। ১৯৩০ সালে তিনি আবার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন— এটা ছিল 'আইন-অমান্য আন্দোলন'। তরুণ নেহরুকে তিনি কথা দিয়েছেন— এবার আর বিরতি নয়, পণ শেষ হবে বিজয়-দিগন্তে। অথচ হঠাৎ তিনি বড়লাট আরউইনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, তাতে পেয়েছেন সামান্য কিছু। তাঁর ভাষাতেই 'consolation prize'— (ড. এস. এন. সেন— হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ২২২)। সারা দেশ বিপুলভাবে সেই সংগ্রামে সাড়া দিয়েছিল—বন্দির সংখ্যা লক্ষাধিক হয়েছিল। কিন্তু সব বৃথা হয়েছে। লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে ডাকা হয়েছিল হেনস্থা করার জন্য। দেশে ফিরতেই তাঁকে বন্দি করা হয়েছে। অত্যাচারের রথচক্র নেমে এসেছে সারা দেশে।

এর পরে আর আন্দোলন হয়নি। নেতারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সমঝোতার জন্য। ১৯৩৭ সালে নির্বাচন হয়েছে ক্ষমতা দানের জন্য ছিঁটেফোঁটা। কংগ্রেস আটটা রাজ্যে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে— গাছে কাঁঠাল ঝুলছে, কিন্তু গোঁফে তেল লাগানোর মহা উৎসাহে নেতারা মজেছেন।

এর ফল কিন্তু হয়েছে মারাত্মক। হতাশ হয়ে মুসলিম লিগ নিয়েছে ধ্বংসাত্মক রূপ। লিগ-নেতারা বলে চলেছেন, তাঁরা নিগৃহীত হচ্ছেন— দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেস রাজত্বে সেই সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই থাকবে না। এই সাম্প্রদায়িকতার বিষই দেশকে নিয়ে গেছে ভারত বিভাজনের দিকে— (হডসন্— দ্য গ্রেট ডিভাইড, পৃ. ৭৫)। অনুরূপভাবে, প্যান্ডেরেল মুন মন্তব্য করেছেন, কংগ্রেসের সংগ্রামহীন

ও নিষ্ক্রিয় রাজনীতি ভারতকে ঠেলে দিয়েছে দেশভাগের দিকে— (ডিভাইড অ্যান্ড কুইট, পৃ. ১৭৪)।

সুভাষচন্দ্র বার বার গান্ধীজীকে বলেছিলেন— আন্দোলন শুরু করার জন্য। তাঁর মতে, সংগ্রাম শুরু করলেই সারা দেশ মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে— সাম্প্রদায়িক চিন্তা ধামাচাপা পড়বে। কিন্তু গান্ধীজী জানিয়েছেন, তিনি আলো দেখতে পাচ্ছেন না।

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সুভাষচন্দ্র চেয়েছেন কংগ্রেস এই সুযোগে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম শুরু করুক। কারণ সেই ইংরেজ তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। কংগ্রেস হরিপুরায় (১৯৩৮) প্রস্তাব নিয়েছিল ব্রিটেন তার 'ফ্যাসিবাদী' নীতির ফলে ইউরোপে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে কোনও ভাবেই তাকে সাহায্য করা হবে না। এবার কিন্তু নেতারা সেই কথা ভুলে গেলেন। গান্ধী জানালেন— 'We do not seek our independence out of Britain's ruin।' আর নেহরু-আজাদ জানালেন— তাঁরা আছেন ব্রিটেনের দিকেই। শুরু হলো তাঁদের সমঝোতার প্রয়াস। সেই সঙ্কট লগ্নেও সরকার নেতাদের লেজে খেলিয়ে চলেছেন। তখনও তাঁরা ব্যাকুল হয়ে খুঁজেছেন সন্ধির সূত্র। সুভাষ লিখেছেন, 'They liked the boot which kicked them।'

১৯৪০ সালে গান্ধীজী একটা অর্থহীন আন্দোলন করেছেন— একজন করে সত্যাগ্রহী রাস্তায় যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি দিয়ে জেলে যাবেন। হাস্যকর এই আন্দোলন ছিল কার্যত শিশুসুলভ।

১৯৪২ সালে তিনি ভারত-ছাড় আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। ইংরেজ সরকারের দমননীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সারাদেশ উন্মাদের মতো ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। দেশের মাটিতে এটাই ছিল স্বাধীনতার শেষ মহাযুদ্ধ। এটা ছিল 'a landmarik in India's struggle for freedom--- (ড. পি. এন. চোপরা-কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, পৃ. ৯০)। কিন্তু অহিংস গান্ধী এর দায় নেননি।

লিগ তখন রয়েছে সরকারের দিকে— এবার 'divide and rule' নীতি হয়েছে সার্থক। দেশকে দ্বি-খণ্ডিত করা হলো। মুসলিমদের জন্য তৈরি হবে পাকিস্তান। পঞ্জাব ও বাংলা দ্বি-খণ্ডিত হলো। রক্তাক্ত হলো প্রায় সারা দেশ। দাঙ্গা, খুন, জখম, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ চলল অবাধে। মৌলানা আজাদ বড়লাটকে বলেছিলেন, দেশভাগ ঠেকানো যায়নি— কিন্তু উদ্বাস্তুদের আসা-যাওয়ার পথে সামরিক বাহিনী রাখা হোক— যাতে ছিন্নমূল মানুষরা ভয় থেকে অভয়ের দিকে আসতে যেতে পারেন।

কিন্তু ক্ষমতার আসনে বসার জন্য ব্যস্ত অন্যরা সেটা নিয়ে ভাবেননি। ফলটা কী হলো? লিওনার্ড মস্‌লে লিখেছেন— 'In the same period 600,000 of them were killed. But not just killed. If they were childran, they were picked up by the feet and their heads smashed against the wall. If they were female childran, they were raped. If they were girls, they were raped and there breasts were chopped off. And of those were pregnant, they were disembodied.'— (দ্য লাস্ট ডেজ অব দ্য ব্রিটিশ রাজ, পৃ. ২৭৯)। মানুষ তখন কী উন্মাদ, কসাই হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় ২৬ আগস্ট থেকে দুই দিনে নরাধম মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির উদ্যোগে 'ক্যালকাটা কিলিং' হয়েছিল। প্রাণ দিয়েছিলেন ১০ হাজার হিন্দু। তারপর পঞ্জাব ও বাংলায় চলেছিল পৈশাচিক হত্যা লীলা। সেই নারকীয় তাণ্ডবে প্রাণ দিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। পঞ্জাবে কয়েক হাজার নারী নদী ও পুকুরে ডুবে মরেছিলেন ইজ্জত বাঁচানোর জন্য। বাংলায় চলেছিল লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যা, ধর্ষণ ও নারীহরণ। ১ কোটিরও বেশি মানুষ হয়েছেন গৃহহারা। ১ লক্ষ অসহায় নারীর ইজ্জত গিয়েছিল। ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষ— (ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ২৯৬)। লক্ষ লক্ষ মানুষ এপারে এসেছেন বন্য প্রাণীর মতো। অনাহারে শীতে রেলস্টেশনে দিন কাটিয়েছেন। সরকারের সাহায্য না পেয়েও কলোনি গড়ে অন্ধকারে ভিখারির জীবন কাটিয়েছেন। তাঁরা স্বাধীনতার কী পেলেন?

নেহরু মস্‌লেকে বলেছিলেন, দেশভাগ মেনে নিতে হয়েছে— কারণ তাঁরা তখন বৃদ্ধ— সেটা না মেনে অখণ্ড স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলে তাঁদের আবার জেলে যেতে হতো— (মস্‌লে ঐ, পৃ. ২৮৫)। অর্থাৎ, তাঁরা কী পেতেন? ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার জন্যই তো এতদিনের নেতৃত্বদান। তাহলে স্বাধীনতা তাঁদের জন্যই?

কথা আরও আছে— কংগ্রেস আগেই প্রস্তাব দিয়েছিল— বড়লাটকে রেখে দিতে হবে ভারতকে প্রশাসনিক বিষয়ে সাহায্য করার জন্য। মাউন্টব্যাটেন চেয়েছিলেন--- দুই ডোমিনিয়ানেই তিনি গভর্নর জেনারেল হিসেবে থাকবেন। জিন্না ও অন্যান্য লিগ নেতারা দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তাবটা বিবেচনার জন্য ঝুলিয়ে রেখে হঠাৎ ঘোষণা করেছিলেন— জিন্নাই পাকিস্তানে ওই পদে বসবেন। বড়লাট 'stayed on as Governor General of India for ten months after the transfer of power'— (মস্‌লে, ঐ পৃ. ২৮৭)। পাকিস্তান যদি পারে, আমাদের নেতারা তাঁকে মাথার ওপরে না রেখে দেশ চালাতে পারেননি কেন? ব্রিটিশ-প্রতিনিধি হয়েও তিনি ভারতের প্রধান শাসক? তাহলে দেশ স্বাধীন হলো কেমন করে?

আর গোয়া-দমন-দিউ তখনও ছিল পর্তুগিজদের দখলে। অথচ দেশ তখন স্বাধীন? অনেক পরে ওই তিনটে জায়গাকে মুক্ত করা হয়েছে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে। তাহলে ১৫ আগস্টের তাৎপর্য কী রইল? সবচেয়ে বড় কথা--- স্বাধীনতা কতজনের জন্য? অর্থনীতিবিদ ধীরেশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, বেকার সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে, বিনষ্ট হচ্ছে যুবশক্তি— (ইন্ডিয়া'জ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্‌স্, পৃ. ১৮৯)। বেড়ে চলেছে আর্থিক বৈষম্যও। দেশের ১০ শতাংশ লোকের হাতে সম্পদের পরিমাণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। শহরের ২০ শতাংশ মানুষ ৯৩ শতাংশ জমির মালিক, আর গ্রামে ৫ শতাংশ লোক ৫২ শতাংশ জমির অধিকারী— (ড. গৌতম সরকার— ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, পৃ. ৬৫)। কোটি কোটি মানুষ তখনও আছেন দারিদ্র্যসীমার নীচে। কয়েক কোটি লোক কখনও স্কুল, হাসপাতাল ও ডাক্তার দেখেননি। অসংখ্য শিশু গ্যারেজ, দোকানে ও বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। পেটের দায়ে অজস্র নারী পণ্য হন। বহু মানুষ স্বল্প মূল্যে শ্রম বিক্রি করেন। ফুটপাতে থাকেন কয়েক লক্ষ অসহায় মানুষ।

তাঁরা স্বাধীন দেশের কেউ? তাঁদের কাছে ১৫ আগস্টের সঙ্গে অন্য দিনের পার্থক্য আছে? ■

বঙ্গের লুটিয়েন মিডিয়ার লাঠিধারীরা

তুষারকান্তি সরকার

'লুটিয়েন্স দিল্লি' শব্দবন্ধটি প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার স্বপন দাশগুপ্তের। জনপ্রিয় 'রিপাবলিক'-এর সঞ্চালক অর্ণব গোস্বামী প্রায়ই প্রাসঙ্গিক ভাবেই লুটিয়েন মিডিয়া, লুটিয়েন ব্রিগেড, লুটিয়েন মাফিয়া ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেন তাঁর রাজনৈতিক বিতর্কসভাগুলি পরিচালনার সময়।

লুটিয়েন সাংবাদিক বলতে 'একটি বিশেষ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আচরিত ঘরানা বুঝায়। তবে কেন 'লুটিয়েন্স দিল্লি'?

ইংরেজ ভাইসরয়দের সময়ে দিল্লির অভিজাত বাংলো প্যার্টানের বাড়িগুলির নকশা করেছিলেন Edwin Lutyens (1869-1944)। এই এলাকায় থাকতেন রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীরা। সাংবাদিকদের একটা অংশের সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সেই সুযোগে ক্ষমতাবান প্রভুরা তাদের কিছু বদ্ধমূল ধারণা এবং দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কিত তাদের পছন্দের ব্যাখ্যা অনুগত মিডিয়ার মাধ্যমে জনমনে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। মনে হয়, একেই স্বপন দাশগুপ্ত 'লুটিয়েন্স দিল্লি' বলে অভিহিত করেছেন।

বর্তমানে এ ধরনের লুটিয়েন চক্রের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে বঙ্গে। সন্ধ্যার টক্‌শোতে বিশেষজ্ঞরা বিশেষ বিজ্ঞতার সঙ্গে বিভিন্ন চ্যানেলের চাহিদা মোতাবেক কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছেন, আবার কাউকে কাউকে মধ্যগগনে তুলে ধরছেন।

বিগত বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে তথাকথিত 'শিলিগুড়ি মডেলের' নামে একটি মিডিয়াহাউস কংগ্রেস-বামদের অনৈতিক জোটের সূর্যকান্ত মিশ্রকে প্রতি রাতের চা-পেয়ালায় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে প্রায় বসিয়ে দিয়েছিল। এখন প্রতি রাতেই নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি থেকে ফেলে দিয়েছেন এবং কোনও আঞ্চলিক নেত্রীকে বা রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিয়ে দিচ্ছেন।

এসব লুটিয়েন মিডিয়ার লাঠিয়ালদের দেখতে দেখতে, প্রিন্ট মিডিয়ায় লাঠিয়ালদের উদ্দেশ্যমূলক লেখা, নিবন্ধ-প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয় পড়ে সচেতন পাঠক-শ্রোতারা তিক্ত, বিরক্ত এবং বিমুখ। এসব লাঠিয়ানরা সবকিছুতেই বিশেষজ্ঞ। এরা ভীষণ ভাবে নিরপেক্ষ মানবতাবাদী, মহাসেকুলার এবং বামমার্গীয়। জঙ্গি আফজল গুরু তাদের 'গুরুতুল্য', জেএনইউ-এর 'টুকরে গ্যাংয়ের' বদমাশ কানহাইয়া, ওমর খালিদ, সাজেলা রশিদ এবং লাঠিয়ান ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতকে দেখতে এবং দেখাতে চায়।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর শবযাত্রা এবং কন্যা নমিতার মুখাগ্নি নিয়ে যেসব সংবাদ প্রকাশিত, তা অনেক ক্ষেত্রেই অযাচিত অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হয়। অটলজীর কন্যা-জামাতাকে নিয়ে আর এস এসের মনোভাব কথিত মন্তব্য নিয়ে মনগড়া বক্তব্য পরিবেশন কিংবা বিজেপির রক্ষণশীল নেতারা নমিতার মুখাগ্নি করাতে খুশি নয়...ইত্যাদি তথ্য সংবাদদাতা কী করে পেলেন? মুখাগ্নির মতো একটা শোকাবহ অনুষ্ঠানের এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে সাংবাদিকরা অর্থাৎ দায়িত্ব পালন করেছেন বটে!

অটলজীর শেষযাত্রায় অশ্রুজলে সিক্ত লক্ষ লক্ষ শোকার্ত ভারতবাসীর সঙ্গে দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের হেঁটে যাওয়া নিয়ে নামগোত্রহীন একজন কংগ্রেসির মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে মোদীকে যেভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে, তা সুস্থ সাংবাদিকতার সীমা অতিক্রম করেছে। লুটিয়েন মিডিয়ার অপদার্থ লাঠিয়ানরা অটলজীকে এক সময় আর এস এসের মুখোশ হিসেবে বর্ণনা করতেও কোনও কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ করেনি।

লুটিয়েন মিডিয়ার মতে 'ভারত বিশেষ ভাগ্যবান— একজন ছাড়া সব প্রধানমন্ত্রীই তাঁদের পদের যোগ্যতাই এবং প্রত্যাশিত আচরণই করে গিয়েছেন, এমনকী এঁদের ব্যক্তিগত মতামতের বিরুদ্ধে গিয়েও'। প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিত নেহরুর ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আচরণরীতির প্রশংসা করেছেন। 'এই পরিপ্রেক্ষিতেই, খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় তাঁরই (বাজপেয়ীর) দলের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী জনপরিসরে কথা বলার সময় নিজের দায়িত্বের প্রতি নিতান্ত অমনোযোগী।' এরপর মোদীর আচরিত কর্মের অনেক বিচ্যুতি এবং অনোপযুক্তের আরও ফিরিস্তি তুলে ধরে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে কার্যত বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে চরমতম উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

লুটিয়েনদের শত শত অপবাদ আর বক্রোক্তি এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সঙ্গে সীমাহীন মিথ্যাচারের পরও নরেন্দ্র মোদী এখনও কোটি কোটি ভারতবাসীর নেতা। উচ্চতায় আর জনপ্রিয়তার তাঁর হাঁটুর সীমান্ত কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। এটাও সত্য অনেক পদাধিকারী পদের পুনর্নবীকরণ করার সুযোগ না পেয়ে মনোরোগে ভুগে মোদীকে ক্রমাগত গালমন্দ করতে লজ্জাবোধ করছেন না।

এধরনে লাঠিয়ানরা অতি সহজেই অভদ্রতা ও অসভ্যতার যে কোনও জায়গায় উঠে যেতে এবং নেমে যেতে পারেন। ধিক-শতধিক-হাজার ধিক। ■

তৃণমূলের পুজোর দখল নীতি বুমেরাং হয়েই ফিরবে

সনাতন রায়

শেষ হলো দুর্গাপুজো। কিন্তু এবারের পুজো বোধহয় সব বাঙ্গালির মনেই একটা প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল। তা হলো, এর আগে কি কখনও দুর্গাপুজো ঘিরে দেখা গেছে এত উন্মাদনা? বিশেষ করে শাসক দলের শিবিরগুলিতে?

দুর্গাপুজো শুধু পুজো নয়। বাঙ্গালির কাছে দুর্গাপুজো উৎসব চিরকালই। ঢাকের বাদ্যি, কাঁসরের নিনাদ, নতুন জামাকাপড়ের গন্ধ, আতর-এসেন্সের সুবাস, রঙিন আলোকমালা, ফুটপাতে রেস্টুরেন্টে জমিয়ে রসাস্বাদন— এ সবই বাঙ্গালির দুর্গাপুজোর অঙ্গ। তা সে রাজবাটির ঠাকুরদালান কিংবা বারো-ইয়ারির পুজো প্যান্ডেল যেখানেই হোক না কেন। কিন্তু এ বছরের পুজোয় সবটাই যেন উলটপুরাণের গল্প। হইচই ছিল, আনন্দ ছিল, মাতোয়ারা ছিল, কিন্তু সব কিছুর আড়ালে ছিল কিছু সন্দেহের উকিঝুঁকিও। কারণ এবারই প্রথম বঙ্গবাসী দেখল দুর্গাপুজো আর আগেকার পুজো নেই। পুজোর দখল এখন তৃণমূলি কর্ত্রীভজাদের দখলে।

পশ্চিমবঙ্গের পুজোয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ নতুন বিষয় নয়। কংগ্রেসি আমলেই এই অনুপ্রবেশকারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় (একডালিয়া এভারগ্রিন), সোমেন মিত্র (কলেজ স্কোয়ার), রেল-প্রদীপ নামে বিখ্যাত প্রদীপ ঘোষ (শিয়ালদহ অ্যাথলেটিক) প্রমুখ। পরবর্তীকালে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার বা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের মতো নামজাদা পুজোগুলিও পরিচালনা করতেন কংগ্রেস নেতারাই। উদ্দেশ্য হিসেবে প্রচার হতো জনসংযোগ। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দু'পয়সা কামানো। চাঁদা, বিজ্ঞাপন, স্পনসরশিপ ইত্যাদির মাধ্যমে রোজগারপাতি নেহাত কম ছিল না। পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্ট বা বামফ্রন্টের আমলে পুজোয় বামনেতাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তেমন না থাকলেও নামে-বেনামে বকলমে চলত একই খেলা। যেমন তখনকার নামি প্রমোটার সুজিত বসু যিনি এখন তৃণমূলি কর্ত্রীভজাদের প্রথম সারির এক বিধায়ক, শ্রীভূমির অধুনা বিখ্যাত পুজোটির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন বিখ্যাত সিপিএম নেতা ও মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণাতেই। পরবর্তীকালে বামপন্থীরা কেউ কেউ সরাসরি দুর্গাপুজোয় অংশ নিয়েছেন এমন নজিরও রয়েছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দুর্গাপুজো কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার কাছে কখনও বিকিয়ে যায়নি।

কিন্তু এবারেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন। দেখা গেল রাজ্যের বকলমা নেওয়া কর্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তৃণমূল কংগ্রেসের বড়, মেজো, সেজো, ন, নতুন, কনে, ছোট— সব দাদারাই দুর্গাপুজোর দখল নিয়ে নিয়েছেন। এমনিতেই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারি তখতে আসীন হওয়ার পর থেকেই গত ৮ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের ঘাসে ঘাসে উৎসবের বন্যা বইয়ে দিয়েছে হাজার সমালোচনাকে তোয়াক্কা না করেই। জনগণের করের টাকায় উন্নয়ন খাতে যত খরচ হয়েছে তার সঙ্গে হয়তো সমান তালেই খরচ হয়েছে উৎসবের পিছনে। নেত্রীর 'মেজাজটাই তো আসল রাজা' নির্দ্বিধায় কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে যা উৎসব, মাটি উৎসব, ইলিশ উৎসব, আহারে বাহারে উৎসব, মৎস্য উৎসব, পিঠেপুলি উৎসব, মিষ্টি উৎসব— এমনি অগুনতি উৎসবের পিছনে। শুধু মানুষ উৎসবটাই এখনো করে উঠতে পারেননি তিনি। যখন জনগণ এইসব উৎসবকেই ছ্যাঁচড়া উৎসব বলে সমালোচনা করেছেন, তখনই গোঁসা হয়েছে মাননীয়ার। গলাবাজি করতে ওস্তাদ নেত্রী বুক ফুলিয়ে বলেছেন— 'উৎসব করেছি, করছি, করবও। বেশ করছি।' তবে কার বাপের টাকায় ওই গলাবাজি সে ব্যাখ্যা দেননি। তাঁর সর্বশেষ কীর্তি সব পুজোয় ১০ হাজার টাকার অনুদান। এমন অকাতরে টাকা বিলোনোর উদ্দেশ্য যে ভোট কেনা সেটা সব মানুষই বোঝেন। এটা লিখে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। কেনই বা বাছাই ক্লাবগুলিকে চার বছর দু' লক্ষ করে টাকা দেওয়া হচ্ছে, সে অঙ্কটাও মানুষ জানে।

আর এবার রাজ্যজুড়ে প্রায় সব পুজোর দখল নেওয়ার কারণটা আরও স্পষ্ট— ২০১৯-এর লোকসভা ভোট। ব্যাপারটা একটু ভালোভাবে

দুর্গা প্রতিমার অলংকরণ করছেন মমতা।

আলোচনা করা যাক। তৃণমূল কংগ্রেস যে অত্যন্ত দ্রুত পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে তার প্রমাণ মিলেছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে। বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধিদের গলা টিপে, জনগণকে ভয় দেখিয়ে কাড়া ভোটের কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে ভোটে জিতেছে তৃণমূল। নেত্রীও বুঝে গেছেন, ২০১৯-এর ভোট বৈতরণী পার হওয়া খুব সহজ হবে না। কারণ কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী প্রকল্পের সব টাকা যে গরিবের ঘরে ঢুকছে না এবং তাঁরই নির্দেশে প্রকল্পের অর্ধেক টাকা ঢুকছে পার্টির তহবিলে আর স্থানীয় নেতানেত্রীদের পকেটে তা তিনি ভালোমতোই বোঝেন। আর এসব তথ্যই এখন মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। অতএব এবার পুজোর দখল নাও।

কারণ :

১। তৃণমূল কংগ্রেস বোঝাতে চায় ধর্মীয় ভাবনায় তারা বিজেপি- আর এস এসের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। অর্থাৎ ধর্মের জিগির তুলে বিজেপি-আর এস এসকে কোণঠাসা করত যে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই-ই এখন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার আকুল চেষ্টায় নেমে পড়েছে।

২। তৃণমূল কংগ্রেস চেয়েছে রাজ্য জুড়ে স্থানীয় দলীয় নেতা কর্মীদের দাপট প্রতিষ্ঠা করতে। নেতৃত্বে ছিল ব্যানার্জি ব্রাদার্স অ্যান্ড পিসি-ভাইপো।

শ্রীভূমির পুজো মণ্ডপে তৃণমূল বিধায়ক সুজিত বসু ও ইন্দ্রনীল সেন।

৩। যখন রাজ্য জুড়ে মানুষ তৃণমূলি অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তখন উৎসবের তবকে পুজো নামক মিঠে পান খাইয়ে মানুষের রাজনৈতিক ভাবনার স্রোত অন্য খাতে বইয়ে দেওয়া।

৪। পুজোর নামে কোটি কোটি টাকা কামাবার ব্যবস্থা করে ফেলা। হয়তো নেত্রীর প্রস্তাব মতো তা ভাগ হচ্ছে ৭৫ : ২৫ অনুপাতে। কারণ এবারই শেষ সুযোগ। এরপর এমন টাকা কামানোর সুযোগ বিশেষ মিলবে না সেটা মুখ্যমন্ত্রী বুঝে গেছেন বিলক্ষণ।

তাই এবারে অনেকটা মরিয়া হয়েই মহালয়ার বোধনের আগেই দুর্গাপুজো উদ্বোধন করে দিয়েছেন। আর বিপত্তি ডেকে এনেছেন নিজেই। ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালি এখন রাস্তায় থুতু ফেলছেন আর বলছেন— 'একি অনাসৃষ্টি কাণ্ড রে বাবা!'

এখানেই শেষ নয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁর সাধের চ্যালাচামুণ্ডারা বহু জায়গায় দুর্গাপুজোর নামে এমন কাণ্ড কারখানা করেছেন যে মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। যেমন ধরুন শ্রীভূমির পুজো। বোধনের আগেই দিদি তাঁর সাধের ভাই সুজিত বসুর কোটি কোটি টাকার পুজোটি উদ্বোধন করেছিলেন। সেই থেকে পুজো শেষের পরের এক সপ্তাহ গোটা এলাকাই ভিড়ের চাপে অগম্য হয়ে উঠেছিল। বরানগরের ন' পাড়ার দাদা-ভাই সঙ্ঘের পুজোর কর্তা স্থানীয় কর্ত্রীভজা তৃণমূল নেতা অঞ্জন পালের হুমকিতে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশন থেকে বিটি রোডের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী মূল রাস্তাটি বন্ধ করে রাখা হলো পুজোর আগে থেকে এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত। সব মিলিয়ে ১২ দিন ওই রাস্তায় বাস চলতে দেওয়া হয়নি। অটো চলেনি। রিকশ চলেনি। এমনকী সাইকেল চালানোর অনুমতিও দেননি ওই নেতা। নেতাজী কলোনির আর এক উঠতি নেতা 'সুনুদা'র নির্দেশে লোল্যান্ডের দুর্গা হয়ে উঠলেন লন্ডনেশ্বরী। খোয়াবে মশগুল 'সুনুদা'। কলকাতা লন্ডন হলো বলে!

রাজ্য জুড়ে এবার এমন উদাহরণ ছড়িয়ে আছে অগুনতি। মানুষ প্রহর গুনছে। নতুন রাজনৈতিক পালাবদলের প্রহর। নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের প্রহর। নতুন সূর্যোদয়ের প্রহর। দুর্গাপুজোকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস যতই চাণক্য কৌশলের ফর্মুলা কষে থাকুক না কেন, সবই গেছে নিজেদের বিপক্ষেই সে প্রমাণ দেবে ২০১৯-এর ভোট। 'চুপচাপ ফুলে ছাপ' মন্ত্রটা এবারও ফুলেই পড়বে। তবে ঘাস ফুলে নয়। ■

গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভ্রান্তি ও প্রাসঙ্গিকতা

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলনের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে। গ্রামেগঞ্জের মানুষ গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। স্বস্তিকায় ২৪ সেপ্টেম্বর রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস দেখিয়েছেন কীভাবে সংহতি ও সমন্বয়ের প্রতীক গান্ধীজী পিছু হঠেছেন। এতো গেল একটা দিক। হিন্দু-মুসলমান সংহতির প্রতীক জীবনের উপান্তে দেখলেন সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধ এক মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধে পরিণত হলো। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর দাপাদাপিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। আশ্চর্য লাগে যখন ১৯৪৬-এর আগস্টে কলকাতায় নরমেধ যজ্ঞ চলছে সে সময় গান্ধীজীর সক্রিয়তা দেখা যায়নি। এক বছর পর ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নরসংহারের খল নায়ককেই পার্শ্বচর করে কলকাতায় শান্তি স্থাপনে বেলেঘাটার হায়দারি ম্যানসনে দু'সপ্তাহ ব্যাপী আসর জমালেন। এতদিন পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভবন অধিগ্রহণ করল।

কিন্তু গান্ধীজীর আসল ব্যর্থতা হলো সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতা। এমনটাই হয়েছিল ১৯২২ সালে। অসহযোগ আন্দোলন যখন দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে সময় তিনি দুটি ভ্রান্তি নিয়ে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিলেন। ১৯২২ সালের ১৪ জানুয়ারি মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগে সরকারের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের জন্য আলাপ আলোচনা শুরু হয়। গান্ধীজীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে এই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। গান্ধীজী পূর্বশর্ত হিসাবে খিলাফত নেতা আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নিঃশর্ত মুক্তি চাইলেন এবং তুরস্ককে সমস্ত এলাকা ফিরিয়ে দিতে বললেন। এছাড়া ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনে সম্পূর্ণ স্বশাসনের দাবি জানালেন। গান্ধীজীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে বোঝাপড়ার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এর কিছুদিন পর (ফেব্রুয়ারি ১৯২২) উত্তরপ্রদেশের চৌরীচৌরাতে ক্রুদ্ধ জনতার হাতে পুলিশ নিধনের ঘটনায় গান্ধীজী বিচলিত হলেন। অচিরে তিনি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। গান্ধীজীর বাস্তববর্জিত একপেশে মনোভাব জাতীয় জীবনে হতাশা সৃষ্টি করেছিল। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন জননেতা চিত্তরঞ্জন দাশ সখেদে মন্তব্য করেছিলেন সারাজীবনে এমন সুযোগ আর ফিরবে না (the chance of a life-time had been lost)। গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের আপোশমুখী নীতিতে সাড়া দিলে রাজবন্দিদের প্রায় সবাই মুক্তি পেত। আর সবচেয়ে বড়ো কথা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে অন্তত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাওয়া যেত। এর জন্য আরও দেড় দশক অপেক্ষা করতে হতো না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন অর্জনের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না। ১৯২২ সালেই এই অধিকার অর্জনের সুযোগ পাওয়া যেতো। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর আন্দোলনের জেদ ধরে রাখতে পারলেন না। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারিতে চৌরীচৌরা কাণ্ডের পর এক তরফা ভাবে আন্দোলন স্থগিত করলেন। লালা লাজপত রায়, সুভাষচন্দ্র বসু এই পদক্ষেপকে হিমলায় সদৃশ ভ্রান্তি (Himalayan blunder) বলেছেন।

কিন্তু আরও মর্মান্তিক হলো ১৯২৩ সাল থেকে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত শুরু হলো। একতরফা ভাবে মুসলমান সম্প্রদায় দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত হলো। গান্ধীজীর সহযোগী আলি ভ্রাতৃদ্বয় গান্ধীজীর পক্ষ ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আসর জমালেন। অচিরেই সুযোগ সন্ধানী জিন্না মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংরক্ষণের দাবি তুলে ধরলেন। এম আর জয়াকর প্রমুখ গান্ধীজীকে প্রথম থেকেই জিন্নার ছলাকলা সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। গান্ধীজীকে বেশি মাত্রায় মাশুল গুনতে হলো। লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক থেকে তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হয়।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা নিয়ে সবচেয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন সি. শঙ্করণ নায়ার (১৮৫৭-১৯৩৪)। বিচক্ষণ শঙ্করণ নায়ার 'গান্ধী অ্যান্ড অ্যাকাডেমি' গ্রন্থে লিখেছেন গান্ধীজী মানুষের মনে আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ইতিবাচক পন্থা দেখাতে পারেননি। এর পরিণতি হলো ভয়ংকর। গান্ধীজী ও কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত বেসামাল হয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে নতি স্বীকার করেন এবং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর দাবার চালে বিদ্ধ হন।

একথা অনস্বীকার্য যে ১৯২০ সালের পর জাতীয় সংগ্রামে গান্ধীজী হয়ে উঠেছিলেন একচ্ছত্র কাণ্ডারি। প্রায় তিন দশক কাল গান্ধীযুগ নামে পরিচিত। গান্ধীজীর নামে সাধারণ গ্রামীণ মানুষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এমনকী তিনি উপজাতিদের কাছে পরিত্রাতা বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। 'গান্ধী বাবা আয়েগা, ইংরেজ বাবা হঠেগা'— এমনটাই ছিল তাদের মনের ভাষা। একটি কার্টুনে দেখানো হয়েছিল গান্ধীজী কারাগারে, আর কারাগারের বাইরে অসংখ্য গান্ধী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের যে বৃদ্ধা কৃষক রমণী পুলিশের বুলেটে আত্মাহুতি দেন সেই মাতঙ্গিনী হাজরা 'গান্ধী বুড়ি' নামে জনমানসে ছাপ ফেলেছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজীর এই বিশালাকায় অতি মানবের স্তরে উত্তরণ ঘটল কেন? পরিস্থিতি তাঁর পক্ষে অনুকূল ছিল। তাঁর গুরু গোখলে ১৯১৫ সালে প্রয়াত হন। ১৯২০ সালে লোকমান্য তিলকের জীবনাবসান ঘটল। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর প্রয়াণ হলো। ১৯২৮ সালে লালা লাজপথ রায় আত্মাহুতি দিলেন। তাই বাকি রইলেন গান্ধীজী ও তাঁর প্রিয় অনুগামীরা। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজী আক্ষরিক অর্থে কংগ্রেস থেকে সরে গেলেন। অথচ তিনিই ছিলেন কংগ্রেস রাজনীতির শেষ কথা।

এখন মজার কথা হলো, সত্য ও অহিংসার পূজারি গান্ধীজীর নাম নিয়ে বিরোধীরা সোচ্চার হয়েছেন। গান্ধীজী হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরোধী ছিলেন, অথচ হিংসাশ্রয়ী ও সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির মদতদাতারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার নামে গান্ধীজীকে স্মরণ করছেন। অন্যদিকে দেখুন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদী গান্ধীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করছেন— কথায় নয়, কাজে। বিগত সত্তর বছরে গান্ধীজীকে কাগজের নোটে আবদ্ধ রেখে তাঁর ভজনা করছে কংগ্রেস দল। স্বাধীনতার পরেই গান্ধীজী রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন, কারণ ক্ষমতার রাজনীতির অলিন্দে প্রবেশ করে কংগ্রেস দুর্নীতি ও অপশাসনের পথ নেবে। গান্ধীজী কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ দিব্য দৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন। ▮

চিঠিপত্র

ভারতেই সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি খবরের প্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। গোয়ার আর্চবিশপ পিএন ফেরাও এক চিঠিতে মন্তব্য করেছেন— দেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার, একই সংস্কৃতির চলছে আস্ফালন, বিপন্ন হচ্ছে সংবিধান ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্মযাজক ফেরাওয়ের এ ধরনের মন্তব্যের কারণ কী? আর সেই কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরতে হবে অতীতে।

পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের শাসনকালে সরকারি মদত ও পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে এসেছিলেন অসংখ্য ধর্মযাজক। তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, এদেশের হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, ভেদাভেদ, হিংসা, ঘৃণা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে বনবাসী, গিরিবাসী, জনজাতি, অবহেলিত তথা অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের সেবার নামে ভুল বুঝিয়ে, আর্থিক প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে, ভয় দেখিয়ে বা কখনও জোরজবরদস্তি খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণ। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুত্ববাদী কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংগঠন ওই সব ধর্মান্তরিত মানুষদের বিপদে-আপদে তাদের দিকে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা প্রদান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সমরসতা ও জাতীয় ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে জনজাগরণ সৃষ্টি করায় ধর্মান্তরিতদের অনেকেই ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এসেছে এবং এখনও আসছে স্বেচ্ছায় স্বধর্মে। তাছাড়া মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায় ওইসব অঞ্চলের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ পাচ্ছে উন্নয়নের সুফল। এক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের গড় রূপে পরিচিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মোদী সরকারের এনইডিএ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা আর্থ- সামাজিক ভাবে উন্নত ও উপকৃত হচ্ছে ওই অঞ্চলের অগণিত বঞ্চিত ও অভাবী মানুষ। ফলশ্রুতিতে হতদরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষেরা আর ধর্মান্তরকরণের ফাঁদে পা দিচ্ছে না। স্বভাবতই ধর্মান্তরকরণে ভাটা পড়ায় এবং ধর্মান্তরিতদের অনেকে 'ঘরবাপসি'র মাধ্যমে স্বধর্মে ফিরে আসায় খ্রিস্টধর্মগুরু বা যাজকরা মোদী-সরকারের উপর হয়েছেন বেজায় খাপ্পা। তাই তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতির সমালোচনা করছেন। তাছাড়া এদেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় যাঁরা ভারতকে খ্রিস্টভূমিতে পরিণত করার ঠিকা নিয়েছেন তাঁরা যথেষ্ট চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ। আবার সেই আর্চবিশপের ওই সব মন্তব্য যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা তাঁর অন্য কিছু কথাতেও প্রমাণিত। তিনি রাজ্যের ক্যাথলিকদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। এর মধ্যে রাজ্যের বিজেপি সরকারকে নির্বাচনে হারিয়ে কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ইতিপূর্বে দিল্লির আর্চবিশপ অনিল কুটাও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

অতপর ওই ধর্মগুরুদের কাছে প্রশ্ন, মুসলমান দেশগুলিতে খ্রিস্টানরা কেন নির্যাতিত, বঞ্চিত এবং বিলুপ্তির পথে? কোনও কোনও দেশে তাদের অস্তিত্ব নেই কেন? এ ব্যাপারে তো আপনাদের সোচ্চার হতে বা 'গেল গেল রব' তুলতে দেখছি না? কেন? কেন নীরব খ্রিস্টান বিশ্বের ধর্মগুরুরা? আর 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' মোদী শাসিত ভারত? সত্যি বলতে কী, ইসলামিক দেশে বিধর্মী (কাফের)-রা অপ্রত্যাশিত। তাই তাদের ইসলামে দীক্ষা নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু ভারত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। তাই এদেশে রয়েছে বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং সমানাধিকার। আর সেই সুবাদে আপনারা যাচ্ছেতাই বলতে পারছেন, ধর্মান্তরিত করতে পারছেন এবং নির্বিঘ্নে করতে পারছেন ধর্ম ও জীবনযাত্রা পালন। মনে রাখবেন, ভারতেই সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ও স্বাধীন।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

স্কুলে চাই কাউন্সেলর

শিশু যখন পৃথিবীতে আসে, তার যাবতীয় নির্ভরতার জায়গাটা তখন মা'কে আঁকড়ে ধরেই তার জগৎ চেনা শুরু। তারপর একটু একটু করে যতই সে বড় হতে থাকে, বাবা এবং পরিবারের অন্য কাছের মানুষদের সে চিনতে শেখে, তাদের উপস্থিতিতে খুশি হয়। জীবনের প্রায় দু-তিন বছর বাবা-মা আর আত্মীয় পরিজনদের প্রভাবেই বড়ো হতে থাকে সে। এরপর স্কুলে যাওয়া শুরু হলে তার জীবনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আনাগোনা শুরু। শিশুর মানসিক বিকাশে বাবা-মায়ের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকাও তাই অনেকখানি।

শিশুর বুদ্ধির তারতম্যটা সাধারণত ধরা পড়ে স্কুলে যাবার পর। পড়াশোনায় সে মন দিয়ে পড়ছে কিনা, পড়া বুঝতে পারছে কিনা, পড়াশোনায় তার আগ্রহ জন্মাচ্ছে কিনা— এসব সাধারণত স্কুলের টিচারেরই প্রথম নজরে আসার কথা। তাছাড়া তার আচরণের অসঙ্গতি, যেমন সে আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে কিনা, সে ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদের বিরক্ত করে কিনা, মায়ের থেকে দূরে থাকার ফলে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠায় সে ভোগে কিনা— শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তার দিকেও খেয়াল রাখতে হয়।

শিশু-কিশোরদের নানাধরনের সমস্যার সমাধানে স্কুল- কাউন্সেলিং একান্ত জরুরি। মেধা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের বিষয়ে ক্লাসের শিক্ষক-শিক্ষিকার পাশাপাশি স্কুল- কাউন্সেলর যেমন বড়

ভূমিকা নিতে পারেন, তেমনি শিশু বা কিশোরটির যদি আবেগগত সমস্যা থাকে, সে যদি অন্যদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারে, অন্যরা যদি সবসময়েই তার পেছনে লাগে, সে যদি আতঙ্ক আর অবসাদে ভুগতে থাকে এবং স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়, তবে তাকে সাহায্যের কাজটা সবচেয়ে ভালো করতে পারেন একজন স্কুল কাউন্সেলর। তাছাড়া বাড়িতে বাবা-মায়ের বনিবনার অভাব এবং অন্যান্য পারিবারিক অশান্তির শিকার যদি হয় কোনও শিশু বা কিশোর-কিশোরী, তবে স্কুল-কাউন্সেলরই পারেন বাবা-মাকে বোঝাতে যার পোশাকি নাম— 'ফ্যামিলি কাউন্সেলিং'। বাবা-মা একজন স্কুল- কাউন্সেলরকে যতটা গুরুত্ব দেন, পেশাদার মনোবিদ বা কাউন্সেলরকে তা দেন না বলে স্কুল-কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন এতটা বেশি।

দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর প্রায় ৪০টি উন্নত দেশ তাদের যাবতীয় স্কুলে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করলেও আমাদের দেশে স্কুল-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর মাত্র ৩ শতাংশ কাউন্সেলরের সাহায্য পান। আশ্চর্যের কথা, পৃথিবীর বহু দেশের আগে মুম্বইয়ের ওয়াবিয়া হাসপাতালে 'টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্স' প্রথম 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটা ১৯৩৮ সালের কথা। ১৯৬০-এর দশকের গোড়াতেই ভারতের প্রতিটি স্কুলে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের হিসাবে, দেশের প্রায় ৩০০০ স্কুলে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল।

যদিও সেই কাজটা করতেন সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকারাই। সম্প্রতি সরকারি তরফে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে যাতে অন্তত সরকারি স্কুলগুলোয় কাউন্সেলিংয়ের জন্য একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নিয়োগ করা যায়। শুধু সরকারি নয়, দেশের সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই এই পরিষেবাটির একান্ত প্রয়োজন সেটা বোঝার সময় এসেছে।

—ডাঃ প্রকাশ মল্লিক,
দমদম, কলকাতা।

আগামীদিনে ভারতের হিন্দুরা কী ভাবছে?

সম্প্রতি দেশ জুড়ে একদিকে এদেশীয় হিন্দু সমাজেরই একশ্রেণীর লোক হিন্দু ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ইসলামি মৌলবাদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ দেখাচ্ছে শুধুমাত্র কিছু পরিমাণ পেট্রোডলার ও মুসলমান তেল ব্যবসায়ী দেশগুলির নিকট থেকে কিছু আর্থিক প্রাপ্তির আশায়। নিজ দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে অবহেলা করে উগ্র ইসলামি মৌলবাদকে সমর্থনকারীরা আজ সারাদেশের হিন্দু সমাজের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সুতরাং আজ হিন্দুদের কাছে সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেবার যে তারা কী চায়। হাজার বছরের পুরানো হিন্দু সভ্যতার বিলোপ সাধন না বিসর্জন? না, নতুন করে তার আবাহন? তবেই একমাত্র দেশটার আটশো বছর মুসলমান শাসন ও দুশো বছর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের ভূত ঘাড় থেকে নামতে পারে। এই পথ কিন্তু খুবই বন্ধুর। কারণ এই পথ ধরে চলে বহু চড়াই উৎরাই পার হলে তবেই অভিষ্ট গন্তব্যে একমাত্র পৌঁছনো সম্ভব।

এখনই চিন্তা করতে হবে ভারতীয় হিন্দু সমাজকে। কারণ ইসলামি মৌলবাদ যেভাবে দিন দিন সারা হিন্দু সমাজকে গ্রাস করতে চলেছে, তাদের পাশবিক কার্যকলাপে যেভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানগুলি কলুষিত, নয় ধ্বংস হচ্ছে তাতে করে একথা আজ বেশ নিশ্চিত করেই বলা যায় যে এর এখনই প্রতিরোধ করতে না পারলে আবার আটশো বছরের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে— তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এক দিকে তারা এদেশেরই কিছু সংখ্যক ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুর সঙ্গে মিশে এদেশের হিন্দু সমাজের ক্ষতি সাধনে উঠে পড়ে লেগেছে। এরাই আজ দেশের সব থেকে বড় শত্রু।

অতএব হিন্দুদের এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। কারণ একটা কথা বেশ ভালো ভাবেই জানা প্রয়োজন কোনওদিনই তেলে আর জলে মেশে না এবং কুকুরের লেজকে শত চেষ্টা করলেও সোজা করা যাবে না। তেমনি হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি জাতি কোনওদিনই ভারতের বুকে এক হবে না ও জাতীয়তাবাদে তারা উদ্বুদ্ধ হবে না। এটাই ধ্রুব সত্য।

আজ সেই প্রসঙ্গে হিন্দুদের আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত শ্রেষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের রণের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আর তা ঘটে ছিল শুধুমাত্র ভারতের পবিত্রতা রক্ষার্থে। ভারতের ইতিহাস এর সাক্ষী। তাই আজ হিন্দুদের নিকট আবেদন যেন তারা এই বিধর্মী মুসলমানদের হাত থেকে এই পবিত্র ভারতভূমিকে প্রাণ বিসর্জন দিয়েও পবিত্রতা রক্ষা করে।

আজ নিশ্চয় আমরা কলকাতার বুকে ১৯৪৬ মাসের বীভৎস হিন্দু হত্যার কথা ভুলে যাইনি, ভুলে যাইনি ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির হিন্দু মহিলাদের গণধর্ষণের কাহিনি। তাদের আত্মীয়দের সামনে তাদেরকে ধর্ষণ করে তাদের হাতের শাঁখা ও পলা ভেঙে দিয়ে মুসলমান ধর্মে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিতকরণের কথা, যা মাত্র ৭০ বছর পূর্বে ঘটেছিল নোয়াখালিতে। আর তাকে সমর্থনও করেছিল গান্ধী থেকে নেহরু পর্যন্ত। একমাত্র বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্যই হিন্দুরা সে যাত্রায় রক্ষা পায়। তাই খুব সাবধান আবার যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

তাই এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। না হলে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবেই আজ না হয় কাল।

—পাঁচুগোপাল ঘোষ,
নরেন্দ্রপুর, মুন্সিরহাট, হাওড়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সুস্থ ও নীরোগ থাকতে শাক খাওয়া প্রয়োজন

রিংকী ব্যানার্জি

বর্তমান যুগে আধুনিকতায় শাক খাওয়ার অভ্যাস কিছুটা ম্লান হলেও বহু পুরাতন এই রীতির বৈজ্ঞানিক যুক্তি অতি বাস্তবসম্মত। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম করে শাক-সবজি খাওয়া দরকার, যার মধ্যে ১২০ গ্রামই শাক বা পাতাজাতীয় হলে শরীর সঠিক পুষ্টি পায়। শাক শরীরের পাচনতন্ত্রকে ঠিক রাখে ও 'অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট' হিসেবে কাজ করে শরীরকে নানাবিধ কঠিন রোগব্যাধি এমনকী ক্যান্সার থেকেও রক্ষা করে।

আবার বেশ কিছু শাক যেমন কুলেখাড়া, ব্রাহ্মী, গিমা, ব্রত শাক— এগুলির ভেষজ গুণাগুণ অপরিসীম ও আমাদের দেশীয় পরম্পরায় বহুকাল থেকে নানাবিধ রোগ নিরাময়ে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বানাতে এসবের প্রচলন রয়েছে।

কুলেখাড়া : বর্ষজীবী ১.৫-২ ফুট লম্বা রোমযুক্ত কাণ্ড। পাতা লম্বাটে, শীতকালে বেগুনি ফুল হয় ও তখন গাঁটে কাঁটা দেখা যায়। মূলত পাতা ও নরম কাণ্ড। মূল ও বীজও ব্যবহার হয়।

গুণাগুণ : রক্তাল্পতায় অত্যন্ত উপকারী। অনিদ্রা, শোথ, বাত ও মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। যৌন দুর্বলতায় শেকড় গুঁড়োর প্রচলন আছে।

উপযুক্ত জমি ও মাটি : ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় ভালো হয়। জমা জল সহ্য করতে পারে না। জলাধারের নিকট টুকরো জমি, ঘরোয়া বাগানে আদর্শ।

বংশবিস্তার : কাণ্ড ও বীজ দ্বারা সাধারণভাবে চাষ করলে কাণ্ডের কাটিং লাগানো দরকার ১×১ ফুট দূরত্বে।

চাষ ও পরিচর্যা : কাটিং বসানোর আগে প্রতি বর্গমিটারে পাঁচ কেজি শুকনো গোবর সার/কেঁচোসার দিলে গাছ সতেজ হবে। আগাছা মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করতে নিড়েন দিতে হবে। বড় আকারে চাষ করলে বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল জৈবসার, ১০ কেজি ইউরিয়া ও ২০ কেজি ১০ : ২৬ : ২৬ সার দিয়ে জমি তৈরি করে একমাস পর চাপান হিসাবে ৮ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে।

চয়ন ও ফলন : ৪-৫ মাস পর শাক কাটার উপযুক্ত হয়। শীতকালে বীজ ও মূল সংগ্রহ করা হয়। শাক হিসাবে প্রয়োজনে সারা বছর লাগিয়ে বাজারজাত করা চলে।

ব্রাহ্মী বা বিরমী শাক : বর্ষজীবী লতানো গাছ। প্রতি গাঁটে শিকড় ও সূক্ষ্ম রোম থাকে। ডিম্বাকার রসালো ছোটো পাতা। গ্রীষ্মে নীলচে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ : পাতা, কাণ্ড ও মূল। সাধারণত শাক হিসাবে ব্যবহার হয়।

গুণাগুণ : বুদ্ধি ও মেধাবর্ধক হিসাবে সুপরিচিত। বায়ু, রক্তদোষ, বাতজনিত দুর্বলতা ও সর্দি-কাশিতে ভালো ফল দেয়।

উপযুক্ত জমি ও মাটি : মাটি হিঞ্চের মতোই ভিজে ও কিছু ছায়াযুক্ত জমিতে ভালো হয়। বড় আকারে চাষ করার জন্য জৈব সারযুক্ত জমিতে কিছু ছায়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বংশবিস্তার : লতার টুকরো/কাটিং দ্বারা বর্ষার শুরুতে দেড় ফুট দূরে কাটিং লাগানো হয়।

চাষ ও পরিচর্যা : ছোটো ঘরোয়া বাগানে চাষ করলে কুলেখাড়ার ন্যায় জৈবসার দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বড় আকারে চাষে বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল জৈব সার, ১০ কেজি ইউরিয়া , ৫০ কেজি সুপার ফসফেট ও ১৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ দিয়ে জমি তৈরি করে কাটিং লাগিয়ে ১ মাস পরে ১০ কেজি ইউরিয়া ও ৮ কেজি পটাস চাপান দিতে হবে। নিড়েন আগাছার জন্য দিতে হবে।

চয়ন ও ফলন : ৩-৪ মাসের মধ্যে লতা শাক কাটার উপযুক্ত হয়। বছরে ২-৩ বার লতা কাটা যায়। ৪-৫ ডাঁটাশুদ্ধ লতা আঁটি বেঁধে বিক্রি হয়। বিঘা প্রতি ৪০-৪৫ কুইন্টাল কাঁচা ও ৮-১০ কুইন্টাল শুকনো সার পাওয়া সম্ভব।

পুদিনা : বর্ষজীবী শাক, পাতা ডিম্বাকার ও ঘন সবুজ, ধার খাঁজকাটা। পাতা ও গাছ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত। সমগ্র গাছ ও নিঃসৃত তেল ব্যবহার করা যায়।

গুণাগুণ : পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর, রক্তাল্পতায় উপকারী। শুকনো গাছের গুঁড়ো দাঁতের পক্ষে উপকারী।

উপযুক্ত জমি ও মাটি : শাকসবজি হয় এরকম সব মাটিতে ও জমিতে চাষ সম্ভব। জমিতে যথেষ্ট জৈব বস্তু থাকলে বাড়বৃদ্ধি ভালো হয়। এই শকত্রা চাষে পর্যাপ্ত সূর্যালোক দরকার।

বংশবিস্তার : শেকড় সহ কাণ্ডের কাটিং বা শুধু কাণ্ডের কাটিং লাগালেই চলে। দেড় ফুট অন্তর সারিতে দেড় ফুট দূরত্বে অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন মাস অবধি লাগানো যাবে।

চাষ-পরিচর্যা : ঘরোয়া বাগানে বা ছোটো স্থানে কুপিয়ে প্রতি বর্গমিটারে পাঁচ কেজি জৈব সার ও ১০০ গ্রাম ১০ : ২৬ : ২৬ দিয়ে কাটিং লাগিয়ে কাটিং তোলার পর ১০০ গ্রাম করে ইউরিয়া চাপান দিতে হবে। বড় পরিসরে চাষে ব্রাহ্মীর মতো বিঘা প্রতি চাষ ও পরিচর্যা ব্যবস্থা নিতে হবে। মাঝে মধ্যে নিড়েন জরুরি।

চয়ন ও ফলন : গ্রীষ্মে এই শাকটির চাহিদা রয়েছে। বড় শহরে পুদিনার শরবত বিক্রি হয়। দু' মাসের মধ্যে শাক ডাঁটাসমেত কাটা চলবে। বিঘা প্রতি ২০-২৫ কুইন্টাল ফলন সম্ভব। বারবার তোলা যাবে। ▮

আদালতে শবরীমালা

১৯৯১

শবরীমালা মন্দির কমিটির সেক্রেটারি বনাম এস. মহেন্দ্রন মামলায় কেরল হাইকোর্ট রায় দেন, যেহেতু মন্দিরে ঋতুমতী মহিলাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বহুকাল ধরে চলে আসছে তাই আদালত এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। নিষেধাজ্ঞা যেমন ছিল তেমনই বলবৎ থাকবে।

২০০৬

কেরল হাইকোর্টের রায় পনেরো বছর বহাল থাকার পর ২০০৬ সালে মন্দিরে প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি আবার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। জনস্বার্থে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে ইয়ং লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের একটি সংগঠন। তাদের অভিযোগ কেরল হিন্দু প্লেসেস অব পাবলিক ওয়রশিপ (অথরাইজেশন অব এনট্রি) ১৯৬৫ আইনটির বিরুদ্ধে। এই আইনের বলেই শবরীমালার মন্দিরে ঋতুমতী মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মন্দির কমিটির আইনজীবী কে. কে. বেনুগোপাল বলেন, 'আইন এবং পরম্পরা উভয় দিক থেকেই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সিদ্ধ।' এরপর মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হয়।

২০১৮

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র জানতে চান মন্দিরে কারোও প্রবেশের অধিকার কেড়ে নেবার অধিকার মন্দির কমিটির আছে কিনা। সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের প্রতিনিধিত্ব করেন দীপক মিশ্র, রোহিংটন নরিম্যান, এ. এস. খানউইলকর, ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, ইন্দু মালহোত্রা প্রমুখ বিচারপতি। সাংবিধানিক বেঞ্চ জানায়, মন্দিরের নিয়মকানুন সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে নয় এবং মন্দিরে ঋতুমতী মহিলাদের প্রবেশ করতে না দেওয়া সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। অতঃপর সুপ্রিম কোর্ট নিষেধাজ্ঞা তুলে দেবার নির্দেশ দেন।

খ্রিস্টান মিশনারিদের ষড়যন্ত্র

এখন যেখানে শবরীমালা মন্দির সেখানে চার্চ বানানোর ষড়যন্ত্র নতুন কোনও ঘটনা নয়। ১৯৫০ সালের ১৫ জুন শবরীমালা মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা তার প্রমাণ। তদন্তে পুলিশ স্থানীয় সিরিয়ান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছিল কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। সরকার ছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের পক্ষে। কেরলের তৎকালীন মন্ত্রী সি. কেশবন বলেছিলেন, 'একটি মন্দির ধ্বংস মানে হাজার-হাজার বছরের কুসংস্কারের অবলুপ্তি।' এরপর ১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ। এবার ঘটনাস্থল শবরীমালা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে নীলাক্কলের মহাদেব মন্দির। মিশনারিরা দাবি করলেন মহাদেব মন্দিরে ২০০০ বছরের পুরনো একটা কাঠের ক্রুশ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, তাদের দাবি, এই ক্রুশ নাকি ভারতে এনেছিলেন স্বয়ং সেন্ট টমাস। এবং চেন্নাইয়ের এক ব্রাহ্মণ খ্রিস্টধর্মের এই বাড়বাড়ন্ত সহ্য করতে না পেরে সেন্ট টমাসকে হত্যা করেন। এই গল্প শুনে সাধারণ খ্রিস্টানরা নীলাক্কলে তীর্থযাত্রায় যেতে শুরু করেন। কেরল সরকার সেখানে চার্চ বানাবার জন্য এক একর জমি দেয়। কুমানন রাজশেখরের নেতৃত্বে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হওয়ায় সরকার পিছু হঠে এবং নীলাক্কল থেকে চার কিলোমিটার দূরে চার্চের জন্য জমি দিতে বাধ্য হয়। এরপর ২০০৬ সালের ২৩ জুলাই। এদিন শবরীমালা মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে অপহরণ করে মিশনারিদের মদতপুষ্ট গুন্ডাবাহিনী। গুন্ডারা প্রধান পুরোহিতকে নিয়ে যায় শোভা জন নামে এক খ্রিস্টান যৌনকর্মীর ফ্ল্যাটে। সারারাত ধরে শোভা জন পুরোহিতের সঙ্গে আপত্তিকর পোশাক ও ভঙ্গিতে ছবি তোলে। পরে পুলিশি তদন্তে জানা যায় প্রধান পুরোহিত নির্দোষ। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে শবরীমালার আশেপাশের জঙ্গলে ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক মেলে। উদ্দেশ্য ছিল বাবরি ধাঁচা ভাঙার বদলা নিতে ভগবান আয়াপ্পার মন্দির উড়িয়ে দেওয়া। বনরক্ষীরা সজাগ থাকায় সে যাত্রা রক্ষা পান ভগবান আয়াপ্পা। এই ষড়যন্ত্রেও ছিল শোভা জনের হাত। তার সঙ্গী ছিল বেচু রহমান এবং বিজু পিটারস। বেচু রহমান দাউদ ইব্রাহিমের দলের লোক। ২০১৬ সালে ইয়ং লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের যে সংস্থাটি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে তাদেরও পুরোভাগে রয়েছে মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা। ■

অগ্নিসংযোগের পর মন্দিরের পুনর্নির্মাণ।

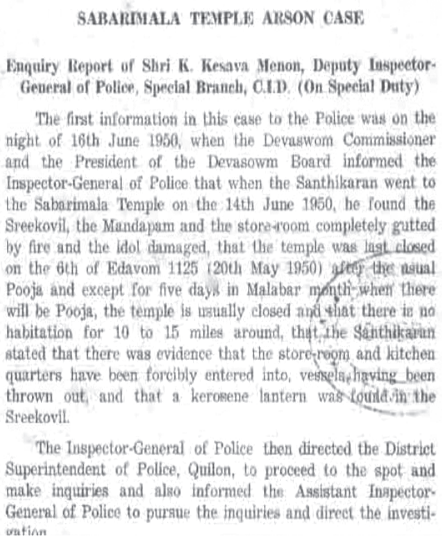

SABARIMALA TEMPLE ARSON CASE

Enquiry Report of Shri K. Kesava Menon, Deputy Inspector-General of Police, Special Branch, C.I.D. (On Special Duty)

The first information in this case to the Police was on the night of 16th June 1950, when the Devaswom Commissioner and the President of the Devasowm Board informed the Inspector-General of Police that when the Santhikaran went to the Sabarimala Temple on the 14th June 1950, he found the Sreekovil, the Mandapam and the store-room completely gutted by fire and the idol damaged, that the temple was last closed on the 6th of Edavom 1125 (20th May 1950) after the usual Pooja and except for five days in Malabar month when there will be Pooja, the temple is usually closed and that there is no habitation for 10 to 15 miles around, that the Santhikaran stated that there was evidence that the store-room and kitchen quarters have been forcibly entered into, vessels having been thrown out, and that a kerosene lantern was found in the Sreekovil.

The Inspector-General of Police then directed the District Superintendent of Police, Quilon, to proceed to the spot and make inquiries and also informed the Assistant Inspector-General of Police to pursue the inquiries and direct the investi-
gation

সনাতন হিন্দু ধর্মকে ছোটো করার চেষ্টা সফল হবে না

সুমিত্রা ঘোষ

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট কেরলের শবরীমালা মন্দিরে সব বয়সের মহিলাদের প্রবেশাধিকার অবাধ করেছেন। তাতে হিন্দুধর্ম কতটা গোঁড়া, পুরুষতান্ত্রিক, মহিলাদের সমানাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কতটা অসহিষ্ণু সেটাই আলোচনা হচ্ছে। কারণ, এই একবিংশ শতকে এসেও যদি দেবস্থানে প্রবেশাধিকার পেতে সুপ্রিম কোর্টের কড়া নাড়তে হয়, তাহলে সেটা সত্যিই খুব চিন্তার বিষয়!

আচ্ছা, শবরীমালা মন্দির ছাড়া ভারতের আর কোনও মন্দিরে কি মহিলাদের উপর নিষেধাজ্ঞা নেই? একনজরে দেখা যাক,

শবরীমালা ছাড়াও ভারতের কোন কোন মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ :

১। কার্তিকেয় মন্দির, হরিয়ানা ও পুষ্কর।

২। ভবানী দীক্ষা মণ্ডপম, বিজয়ওয়াড়া।

৩। রাজস্থানের রনকপুরের জৈন মন্দিরে রজঃস্বলা অবস্থায় নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৪। কেরলের পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে মহিলারা পুজো দিতে পারলেও গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারেন না।

এবার সত্যিই মনে হচ্ছে তো যে হিন্দুধর্মে নারীরা বঞ্চিত! কিন্তু দাঁড়ান, আগে জেনে নিই এই বাধা, এই নিয়ম কী শুধু মেয়েদের জন্যেই? ভারতে কোনো মন্দির বা ধর্মীয় উৎসবে পুরুষদের কি এভাবে ব্রাত্য করে রাখা হয়?

উত্তর : হ্যাঁ হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৫টি মন্দির আছে যেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ :

১। আটুকাল মন্দির, কেরল : হ্যাঁ, এটা সেই শবরীমালার রাজ্যেরই একটা মন্দির যেখানে শুধুমাত্র মহিলারা প্রবেশ করতে পারেন। এমনকী সেখানকার বিখ্যাত 'পোঙ্গল' উৎসবেও পুরুষরা অংশ নিতে পারেন না। ফি বছর, প্রায় তিরিশ লক্ষ মহিলার স্বতঃস্ফূর্ত সমাগমে জমজমাট এই উৎসব 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্'-এ স্থান পেয়েছে। পুরুষদের কোনও স্থান নেই এখানে।

২। চাক্কুলাত্থুকাভু মন্দির, কেরল : ভগবানের আপন দেশের দ্বিতীয় মন্দির, যেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। দেবী ভগবতীর এই মন্দিরে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবার আয়োজন করা হয় এক বিশেষ নারীপূজা, যে পুণ্যদিনের স্থানীয় ভাষায় নাম 'ধনু'। উপবাসী ব্রতকারিণীদের পা ধুইয়ে দেন মন্দিরের 'পুরুষ' পুরোহিত। অন্য কোনও পুরুষ প্রবেশ করতে পারেন না।

৩। ব্রহ্মা মন্দির, পুষ্কর, রাজস্থান : পুরাণ অনুযায়ী, দেবী সরস্বতী দ্বারা অভিশপ্ত এই মন্দিরে কোনো বিবাহিত পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কথিত আছে, পুষ্কর জলাশয়ের তীরে এক যজ্ঞের আয়োজন করেন ব্রহ্মদেব। অর্ধাঙ্গিনী দেবী সরস্বতী সময়মতো উপস্থিত না হতে পারায়, উপায়ান্তর না দেখে, ব্রহ্মা দেবী গায়ত্রীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন ও যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ক্রুদ্ধ দেবী সরস্বতী অভিশাপ দেন, মন্দিরে কোনও বিবাহিত পুরুষ প্রবেশ করলে, তার বিবাহিত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। চতুর্দশ শতাব্দীর এই মন্দিরে তাই পুরুষরা ব্রাত্য।

৪। ভগবতী মন্দির, কন্যাকুমারী : এই মন্দিরে একমাত্র মহিলারা ও সন্ন্যাসী পুরুষই দেবী দুর্গার কুমারী রূপের দর্শন পাওয়ার অধিকারী। বাকি পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই।

৫। ভগবতী মাতা মন্দির, বিহার : বিহারের মুজাফ্‌ফরপুরের ভগবতী মাতা মন্দিরে

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কেরলের মহিলাদের প্রতিবাদ।

বছরের একটি বিশেষ সময়ে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। সেই সময় শুধু মহিলারাই প্রবেশ করতে পারেন মন্দিরে।

এখানেই শেষ নয়, ভারতের একটি মন্দিরে পুরুষ ও মহিলা কাউকেই গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দির, মহারাষ্ট্র : আগে ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারতেন না মহিলারা। পুরুষরা যদিও সকালে এক ঘণ্টার জন্যই প্রবেশাধিকার পেতেন সেখানে। সমানাধিকার প্রদান করে ন্যায় সাধন করতে, মুম্বাই হাইকোর্ট ২০১৬ সাল থেকে, গর্ভগৃহে পুরুষদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করেন।

দুর্গাপুজায় কুমারী পুজো বা নবরাত্রির 'কন্যা পূজন', কই সেখানে তো কোনও ছেলেকে পুজো করা হয় না। শুধু মেয়েদেরই পুজো হয়। ছেলেরা কি এবার আদালতে যাবে, কুমার পুজো করার দাবি তুলে? হিন্দু ধর্মের অনেক আচার অনুষ্ঠানই শুধু মহিলাদের, যেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কী বলবেন এইসব শুনে? পুরুষের সমানাধিকার লঙ্ঘন? আসলে, প্রত্যেক ধর্ম বা ধর্মস্থানের কিছু নিজস্ব সংস্কার বা নিয়মকানুন থাকে। ক্ষতিকারক না হলে, আদালতের সেখানে নাক না গলানোই ভালো বলে মনে হয়।

ঠিক যে কারণে, গুরুদ্বারায় গেলে মাথা ঢাকতে হয়, মসজিদে গেলে ইসলামসম্মত পোশাক পরতে হয়, ঠিক সেই কারণেই ব্রহ্মচারী ভগবান আয়াপ্পার মন্দিরে ঋতুমতী নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এখানে মাথায় রাখতে হবে আমাদের মন্দিরগুলো কোনো মিউজিয়াম নয় যে সেখানে কেবল সেলফি তুলতে বা ঘুরতে যাওয়া হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোটি কোটি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও সংস্কার। তাই সেটা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলাই ভালো।

কেউ নাস্তিক হতেই পারেন, কিন্তু তাই বলে অন্য মানুষের বিশ্বাসে নাক গলানোর অধিকার তাঁর নেই। একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই শবরীমালা মন্দিরের রায়ের পরও এমন অনেক মহিলা থাকবেন, যাঁরা মন্দিরের বিশ্বাসের, এতদিনের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্দিরে ঢুকবেন না। সেই শ্রদ্ধাকে বুঝতে না পেরে, প্রগতিশীলতার নামে এগুলোকে পুরুষতান্ত্রিক মগজধোলাই বলে অতি সরলীকরণ না করাই ভালো।

ভগবান আয়াপ্পানের অল্পবয়েসি মহিলা ভক্তদের কোনও তাড়া নেই। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম মেনে পঞ্চাশ বছর বয়েস হবার পর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ভগবান আয়াপ্পানের দর্শন করতে চান। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তারা যাই বলুন, অধ্যাত্মবাদী ভারতে পরম্পরার শেকড় যে বহু গভীরে প্রোথিত কেরলের মহিলাদের এই ভাবনাই তার প্রমাণ। সব থেকে বড়ো কথা, এদের মধ্যে রয়েছেন বহু উচ্চ শিক্ষিত, এমনকী বিদেশে শিক্ষিত মহিলারাও। গ্রাম ও শহরের ভেদাভেদ তুলে তারা সকলেই ভগবান আয়াপ্পানের ভক্ত। ভগবান যেহেতু ব্রহ্মচারী এবং তারা যেহেতু ঋতুমতী— তাই তারা অপেক্ষা করবেন। ঋতুর দিন যেদিন শেষ হবে সেদিনই তারা পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে উপস্থিত হবেন ভগবানের কাছে। তার আগে নয়।

এবার দেখা যাক, শবরীমালা মামলার প্রধান আবেদনকারী কে? ইন্ডিয়ান ইয়ং ল'ইয়ার অ্যাসোসিয়েশন বলে একটি সংগঠন। যার সভাপতির নাম নওশাদ আহমেদ খান! ওর এই সমানাধিকার পাইয়ে দেওয়ার লড়াই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হতো না, যদি তিনি শবরীমালার সঙ্গে নিজামুদ্দিন দরগার (দিল্লি) সংরক্ষিত স্থানে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়েও সরব হতেন। অথবা দিল্লির জামা মসজিদে, মাগরিবের নমাজে যাতে মহিলারা অংশ নিতে পারেন, সেই নিয়েও সওয়াল করতেন। উল্লেখযোগ্য ভাবে তিন তালাক, নিকাহ হালালা প্রভৃতি মুসলমান মেয়েদের অধিকার নিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ মামলা সম্পর্কে কিন্তু ভদ্রলোকের বা তাঁর সংগঠনের কোনও বক্তব্য জনসমক্ষে নেই। এসব ব্যাপারে ওর এই অদ্ভুত নীরবতা সত্যিই বেদনাদায়ক। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলি। ভারতবর্ষে মোট মন্দিরের সংখ্যা কত? ২০ লক্ষেরও ওপরে। সেখানে এই লিঙ্গভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিয়ে বাধা কতগুলোতে আছে? নারী-পুরুষ সব মিলিয়ে কুড়িটাও হবে না বোধহয়। আর শুধু নারী ধরলে? পাঁচটা। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে আরও পাঁচটা যোগ করে দেওয়া গেল। মোট দশটা। তাহলে শতাংশের হিসেবে কী দাঁড়াচ্ছে। ২০ লক্ষে খুব বেশি হলে ১০টা = ০.০০০৫%। আর বাকি ৯৯.৯৯৯৫% মন্দিরে কিন্তু এরকম কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

অথচ সেখানে এই একটা শবরীমালা মন্দির নিয়ে বিগত একমাস ধরে এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যেন হিন্দুধর্মের প্রায় সব মন্দিরেই মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই। হিন্দুধর্ম একটা চরম নারীবিদ্বেষী ধর্ম, এখনো, এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মহিলাদের শোষণ করে যাচ্ছে ইত্যাদি।

এবার আরেকদিকে দেশে মসজিদের সংখ্যা আর তার মধ্যে কতগুলোতে মহিলাদের

প্রবেশাধিকার থাকলেও, দূরে অন্যপাশে কোনও অচ্ছুতের মতো বা পর্দার আড়ালে বসার বদলে, পুরুষদের সঙ্গে একই স্থানে বসে নামাজ পড়ার, প্রার্থনা করার অধিকার আছে, সেটা এবার একটু খুঁজে দেখুন। বাকি মসজিদের কথা বাদ দিন, ভারতের সব থেকে প্রগতিশীল দুটি বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ক্যাম্পাসে যে মসজিদগুলো আছে, সেগুলোতেই মহিলাদের নামাজ পড়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। সেসব নিয়ে কোনও আন্দোলন, ফেসবুক বিপ্লব, মামলা কিছু হয়েছে? কেউ দেখেছেন?

এই যে এতো এতো প্রগতিশীল, নারীবাদী, এমনকী নাস্তিকরাও হঠাৎ করে হিন্দু নারীদের পুজো করার অধিকার নিয়ে এত সচেতন হয়ে উঠেছেন, হিন্দুধর্ম কতটা খারাপ সেই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পাতার পর পাতা লিখে বিপ্লব করলেন, তাঁদের কাউকে এসব নিয়ে একটাও কোনও মন্তব্য করতে দেখেছেন? তাই একটা কথাই বলতে চাই যে, এই একপেশে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'নারীর সমানাধিকার' এর লড়াইতে মেতে ওঠার আগে নিজের অধিকার আর লড়াইয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হোন। সনাতন ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলির ইতিহাস ও রেওয়াজ জানুন। পড়ুন বুঝুন, তারপর সিদ্ধান্তে আসুন। 'ঝাঁকের কৈ' হবেন না।

শবরীমালার ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। জেন্ডার ইকুয়ালিটি পেয়ে মেয়েরা সাপের পাঁচ পা দেখছে। খ্রিস্টানদের কথা জানি না, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের রজঃস্বলা হবার দিনেই মা ঠাকুরঘরে না ঢোকার শিক্ষা বুঝিয়ে দেন। মুসলমানদেরও তাই। ফেমিনিস্টগুলো ছাড়া মন্দিরে ঢোকার জন্য দক্ষিণ ভারতীয় একজন মহিলাও ছিল না। তার মধ্যে যে দুজন রোজ জবরদস্তি ঢোকার চেষ্টা করেছে, তাদের দুজনের নাম হলো মিস জিমি সি এস এবং রেহানা ফারহানা। কত গভীর চক্রান্ত ভাবুন।

শরবীমালা আখ্যান পরিকল্পিত দেশদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র।

এই প্রবন্ধের শিরোনামে যা লিখেছি সেটা আমার ব্যক্তিগত মতামত আর বোধহয় নয়। শিক্ষিত রাজনীতি সচেতন লক্ষ লক্ষ দেশবাসীরও এই মত বলে এখন বিশ্বাস। ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি ভারতের অখণ্ডতার সংজ্ঞা। এই অখণ্ডতার শিকড়ে কুঠারাঘাত করার চেষ্টা আজ প্রথম নয়। যবে থেকে এই দেশে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান তবে থেকেই হয়ে আসছে। স্বাধীনতার আগে বা আন্দোলন চলাকালীন এদের অস্তিত্ব ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীনতায় এদের কোনো অবদান নেই। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিপর্যস্ত ভারতকে নতুন করে গঠনের কাজেও এদের বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেই। বরং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আর জনসঙ্ঘের চোখে ধুলো দিয়ে সদ্য জন্ম নেওয়া কমিউনিস্ট পার্টি কোনওমতে নিজেকে গোছানোয় ব্যস্ত ভারতমাতাকে মাওবাদী চায়নার হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত করে ইন্দো-চায়না ওয়ার বাঁধিয়ে ছিল। তিন লক্ষ অপ্রস্তুত ভারতীয় সেনা আত্মবলিদান করে দেশকে রক্ষা করেছিলেন। সেই থেকেই এদের অশুভ উদ্দেশ্যে দেশের ক্ষতি সাধন করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, যা আজকের দিন অবধি চলে আসছে।

শ্রমিক দরদি, কৃষক দরদি, উদ্বাস্তু দরদির মুখোশ পরে এরা ধীরে ধীরে রাজনীতিতে শিকড় গেড়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রদের মগজ ধোলাই করে নকশালবাদ-মাওবাদ তথা সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়ে চিরকালীন অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে। শ্রমিক-কৃষকরা যেমন ছিল তেমনই রয়েছে, হাতে রক্ত মাখা লাল পতাকা নিয়ে জীর্ণ দেহে এদের মিছিলের ভিড় বাড়ানোর কাজ ছাড়া আর কিছু পায়নি। আর উদ্বাস্তু শরণার্থীরা? আন্দামানের জংলি দ্বীপ, কালাহাণ্ডির পাথুরে জমি, মরিচঝাঁপির নোনা জলে মেয়েদের কৌমার্য বিসর্জন দিতে হয়েছে এক কলস পানীয় জলের বিনিময়ে। বাধা দিলে পরিবার সুদ্ধ হত্যা করে সমুদ্রের নীল জলকে রক্তলাল করা হয়েছে। ভারতের যে কটা রাজ্যে এরা এক সময় শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল সবগুলোতেই মধ্যযুগের বর্বরতার স্বাক্ষর ফেলে রেখে এসেছে পেছনে। কারণ, দেরিতে হলেও একদিন মানুষ ওদের

শবরীমালা ছাড়াও ভারতের এই মন্দিরগুলিতেও মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

১। কার্তিকেয় মন্দির, হরিয়ানা ও পুষ্কর।

২। ভবানী দীক্ষা মণ্ডপম, বিজয়ওয়াড়া।

৩। রাজস্থানের রনকপুরের জৈন মন্দিরে রজঃস্বলা অবস্থায় নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৪। কেরলের পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে মহিলারা পুজো দিতে পারলেও গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারেন না।

মুখোশ খুলে ফেলার সাহস অর্জন করতে পেরেছিল। একে একে নিভেছিল দেউটি। বর্তমানে প্রদীপের তেল নেই ক্ষয়িষ্ণু সলতে নিয়ে টিম টিম করে জ্বলছে ঔদ্ধত্যের অন্তিম স্বাক্ষর 'কেরালা'। কিন্তু মানুষের রায়ে গদিচ্যুত হবার লজ্জা তো কী কমিউনিস্ট কী কংগ্রেস কারোরই নেই। বেশরম দুই পরস্পর বিরোধী দলের সম্পর্ক সাপ আর নেউলের মতো ছিল এতকাল। সিংহাসনের সুখ হারিয়ে মান-ইজ্জতের পরোয়া করার সামান্য ইজ্জৎটুকুও আর ধরে রাখতে পারেনি দুই দল। স্বার্থের খাতিরে আজকাল এদের গলায় গলায় ভাব।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!

এরাই ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংহ, নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে সন্ত্রাসবাদী বলে অপমান করেছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অমর্যাদা করে চলেছে। ক্ষুদিরাম, ভগৎসিংহ, নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ, সর্দার প্যাটেল স্বাধীনতার এইসব সোপানদেরই যদি দেশের জন্য কোনও অর্ঘ্য নিবেদন না থাকে তাহলে কাদের আছে? উড়ে এসে জুড়ে বসা বিদেশিনী মহিলা আর তার মোদী অবসেশনে ভুগতে থাকা মানসিক অসুস্থ পুত্রের?

শবরীমালা এপিসোড এখন আর কারো অজানা নেই। নবম শতকে তৈরি প্রাচীন এই হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব কেরলের থনামথিট্টা জেলার ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল তিনশো বছর পর দ্বাদশ শতকে। পাণ্ডালাম রাজপুত্র মানিকানন্দন মন্দিরে ব্রহ্মচারী রূপে ভগবান আয়াপ্পার বিগ্রহ খুঁজে বের করেছিলেন এবং তখনই ওই মন্দিরে রজঃস্বলা মেয়েদের প্রবেশাধিকার রদ করে দিয়েছিলেন। ৮০০ বছর ধরে হিন্দু রমণীরা ভক্তিভরে ভগবান আয়াপ্পার পূজা দূর থেকে করতেন, কখনও কাছে যাবার প্রয়াস করেনি কেউ। এই প্রথম ইয়ং ল ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে এক সংস্থার ভক্তি পাসরিজা নামের এক ফেমিনিস্টের পক্ষ থেকে সব বয়সের মেয়েদের ওই দেবস্থলে ঢোকার অধিকার দাবি করে নওশাদ আহমেদ খান নামে এক ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে পি আই এল দাখিল করেন। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রের নার্সা আপ্পামালি মন্দিরে মেয়েদের প্রবেশ অধিকার মেনে নিয়েছিলেন মুম্বাই হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টকে যার ফলে হাজিআলি দরগা এবং শবরীমালা মন্দিরে একরকম রায় দিতে হয়েছে।

কংগ্রেসের তো তবুও নতুন ভারত গঠনে নেহরু থেকে রাজীব গান্ধী পর্যন্ত অবদান ছিল। এটা অনস্বীকার্য। পরিবারতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে নেপোটিজমের প্রবল প্রতাপের দোষে দোষী হলেও ওরা ষাট বছরের শাসনকালে কিছুই করেনি একথা বলা যায় না। কিন্তু কমিউনিস্টরা কী করছে দেখা যাক। ওরা এডুকেশানাল ইনস্টিটিউট- গুলোকে ক্যাডার তৈরির কারখানা বানিয়ে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, সহাবস্থান সবকিছুর ওপরেই নিজেদের আইডিওলজির তকমা লাগিয়ে বিভিন্নতার মধ্যে একতার সংজ্ঞাটারই শিরচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করার পরিকল্পনা করেছে এবং এখনও করে চলেছে। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে, ইউনিভার্সিটির করিডোরে ছেলেধরার মতো ওদের দালালরা ছাত্র ধরে মগজধোলাই করত আমাদের সময়ে। এখনও যাদবপুর, জে এন ইউ ইউনিভার্সিটিতে দেশকে টুকরো টুকরো করে ভাঙার খেলাই চালিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বলুন তো শ্রীযুক্ত ডি রাজামশাই, সীতারামইয়েচুরিদের জে এন ইউ ইউনিভার্সিটিতে কী কাজে ঘন ঘন যেতে দেখা যায়? কেন এই সব ইউনিভার্সিটির এক শ্রেণীর হিন্দু ছাত্ররা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে নাড়াবাজি করে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে থাকে? কারণ ওই কমিউনিস্ট নেতারা হিন্দু ধর্মকে শেষ করে দেবার উদ্দেশে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বাড়াবাড়ি রকমের ফেমিনিজম, এনজিও-র আড়ালে হিন্দু বিরোধী অ্যাক্টিভিজম, হিউম্যান রাইটসের মুখোশ পরে সাপোর্টার অব টেরোরিজম ফলাও করে প্রচার করে চলেছে। মিস্টার জন দয়াল, সুনীল চৌহান, দীনেশ ভাসনি, ডি রাজা, অরুন্ধতী রায়রা বারংবার শ্রীনগরে সেপারেটিস্টদের সঙ্গে মোলাকাত কেন করে? অরুন্ধতী রায়, মনিশংকর আইয়ার, নতুন সংযোজন নবজ্যোৎ সিধুদের শত্রু দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে এতো প্রেম কেন?

বলছি কেন— পাকিস্তান ফাঁকিস্থান হয়ে গেল ভারতের বিরুদ্ধে বিষ উগরাবার জন্য, একদিকে টেরোরিস্ট অন্য দিকে ওইসব সিধু, দয়াল, রায়দের লবি পুষে পুষে। যে যত বেশি বেশি হিন্দু বিরোধী ভারত বিরোধী বক্তব্য তরোয়ালের মতো ধারালো ভাষায় বর্ণনা করতে পারবে তার বাজার দর বেশি —এ হলো মায়ার (টাকার পড়তে হবে) খেলা ভাই! কেরালার শবরীমালা, মহারাষ্ট্রের নারাসা আপ্পামালি, হাজিআলি, আপাতত এই তিনটি ধর্মস্থলে কোর্টের মাধ্যমে মানুষের আস্থায় বংশদণ্ড দিয়ে লবিয়িস্টরা জিতে গেছে, কিন্তু আনন্দের বিষয় হলো ৯৯ শতাংশ হিন্দু অথবা মুসলমান রজঃস্বলা মহিলারা হাজার বছরের প্রচলিত আস্থায় বিশ্বাস রেখে নিজ নিজ ধর্মস্থান অপবিত্র করতে যাচ্ছেন না।

কোনও হিন্দু মেয়ে রজঃস্বলা অবস্থায় মন্দিরে তো দূরের কথা বাড়িতে ঠাকুর ঘরেও প্রাণ গেলেও প্রবেশ করবে না একথা বোধহয় নাস্তিকরা জানেন না। জানেন না যে প্রথম পিউবার্টির দিনেই মা মেয়েকে এই কয়দিন দেবতার আসন পাতা আছে এমন জায়গায় না যাওয়ার শিক্ষা এবং পাপের ভয় দুটোই মগজে ঢুকিয়ে দেন।

সন্ন্যাসী-স্থানীয় লোকজন এবং পূজারি মিলে মন্দির খোলার দিন থেকে বন্ধ হবার দিন পর্যন্ত কঠোর ভাবে প্রতিরোধ করে দেবতার পবিত্রতা রক্ষা করেন। এসব আমরা টিভিতে দেখেছি। তথাকথিত প্রগতিশীল মহিলাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু মহিলারা ভক্ত একজনও ছিলেন না। মুসলমান আর খ্রিস্টান মহিলা, রেহানা ফতিমা ইত্যাদি ভগবান আয়াপ্পার মন্দিরে কেন ঢুকতে চেষ্টা করছিল সেটাই প্রশ্ন। যার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের ওপর এই আক্রোশ তারাই মেটাতে চাইছে যাদেরকে হিন্দু-মুসলমানরা ব্যালটে ক্ষমতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ধর্মের দুর্বল স্থানে আঘাত করলে বেশি ব্যথা হয় ষড়যন্ত্রকারীরা সেকথা খুব ভালো করে জানে বলে এই ভাবে ভয় দেখাবার অভিসন্ধি এঁটেছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় বের হবার পর হিন্দু বিরোধী লবির অ্যাক্টিভিস্ট মহিলারা হিন্দু আস্থা ভাঙবার এবং মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্যে গর্ভগৃহে ঢোকার জন্য সমবেত হয়। ধর্মের অপমান করার চেষ্টা তাই ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র আরও বহুদিন চলবে এই আগাম আশঙ্কা করে রাখলাম। বিজেপিকে সাবধানে থাকতে হবে। আর নরম পন্থা চলবে না। দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহীদের কাশ্মীরের টেরোরিস্টদের মতোই দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হতেই হবে।

শবরীমালায় অশান্তি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি কেরলের শবরীমালা মন্দিরে নারীর প্রবেশাধিকার নিয়ে অভূতপূর্ব শোরগোল শোনা গেল, যাকে বলে তুলকালাম কাণ্ড। মিডিয়ার চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল শবরীমালা মন্দির না জানি কী ভয়ানক অপরাধ করে চলেছিল। বিষয়টা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেল মহামান্য আদালত বিষয়টা বিচারবিবেচনা করে রায় দিয়েছে যে, এখন থেকে ওই মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার অবাধ থাকবে, কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না।

আমরা সকলেই জানি যে প্রতিটি মন্দিরের, মসজিদের, গির্জার, গুরুদ্বারের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন থাকে, যেমন প্রতিটি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের, অফিস-আদালতের সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব নিয়মকানুন থাকে, সংস্থার শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে। শবরীমালা মন্দিরের নিয়ম ছিল যে দশ বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের, আর পঞ্চাশের কম বয়সের মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া যাবে না। দীর্ঘদিন এই নিয়ম চলে আসছিল, কোনও মহিলা এই নিয়মের বিরোধিতা করেননি। বিরোধিতা না করার কারণ ওই বয়সের মেয়েরা ঋতুমতী হয়, সেই কারণেই ওই নিষেধজ্ঞা। এটা সবার জানা। আমাদের সকলেরই বাড়িতে, ঘরে রজস্বলা নারী কখনই কোনও পূজা-অর্চনার কাজে অংশগ্রহণ করে না, এমনকী ঠাকুরঘরে ঢোকে না পর্যন্ত। অনেক পরিবারে মাসের ওই কয়দিন মহিলাদের রান্না পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না। সম্ভবত মেয়েদের ওই ক'টাদিন বিশ্রাম দেবার জন্য এই নিয়ম পালন করা হয়। আরেকটি কারণ হতে পারে যে রজস্বলা নারী ঠাকুরঘরে বা রান্নাঘরে ঢুকলে অসাবধানতাবশত ওই ঘরের মেঝে অপরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। এই সম্ভাবনাটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো শবরীমালা মন্দির ভারতের একমাত্র মন্দির নয় যেখানে এই নিয়ম বহাল আছে। বিজয়ওয়াড়ার ভবানী দীক্ষা মণ্ডপম মন্দিরে, হরিয়ানার কার্তিকেয় মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেরলেই পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে মহিলারা পজো দিতে পারেন, কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রাজস্থানের একাধিক জৈন মন্দিরে ঋতুমতী নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শবরীমালা মন্দিরে নারীর প্রবেশাধিকার নিয়ে যাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন, তারা কি খবর রাখেন যে ভারতে একাধিক মন্দির, দেবস্থানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ? কেরলেরই আটুকাল মন্দিরে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। এই কেরলেই দেবী ভগবতীর মন্দিরে আছে, যার নাম চাক্কুলাত্থুকাভু মন্দির যেখানে শুধু মহিলারাই ঢুকতে পারেন। রাজস্থানের পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দিরে কোনও বিবাহিত পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। বিহারের মুজফ্‌ফরপুরের ভগবতীমাতা মন্দিরে পুরুষের প্রবেশ সংক্রান্ত কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে, মহিলাদের জন্য কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। মহারাষ্ট্রের ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে নারী-পুরুষ কেউই প্রবেশাধিকার পান না।

মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে সরব ভূমাতা ব্রিগেডের মহিলারা।

> এত প্রতিবাদের ঘটা, সর্বোচ্চ আদালতে ছুটে যাওয়া সবটাই হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার একটি অপচেষ্টা মাত্র। হিন্দুধর্ম কী পরিমাণ নারীবিদ্বেষী, এটাই যেন প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমাদের ভারতীয় সমাজে বহু অনুষ্ঠান রয়েছে যেখানে শুধু মেয়েদেরই ভূমিকা থাকে। যেমন দুর্গাপূজায় 'কুমারী পূজা' হয়ে থাকে, 'কুমার পূজা' বলে কিছু হয় বলে শুনিনি। অবাঙ্গালি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা হলো 'সঙ্গীত' ও 'মেহেন্দি' এই দুটি অনুষ্ঠান কন্যার বিবাহের পূর্বে ধুমধাম সহকারে পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পুরুষের অংশগ্রহণের নিয়ম নেই। কেরলে অতি জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান পোঙ্গল। প্রতি বছর খুব ধুমধাম সহকারে এই অনুষ্ঠান হয় যেখানে কেবলমাত্র মহিলারাই অংশগ্রহণ করেন। লক্ষ লক্ষ মহিলা এই উৎসবে শামিল হন, গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্-এ এই উৎসব উল্লিখিত হয়েছে। এই উৎসবে পুরুষরা ব্রাত্য। এই রকম হরেক আচার অনুষ্ঠান আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যেখানে মহিলারাই অগ্রাধিকার পান। যদিও এই সব ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির খরচ মূলত পুরুষরাই বহন করেন, কিন্তু তারা সেই কারণে নিজেদের অধিকারের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে কখনো শুনিনি।

আবার এর বিপরীত চিত্রটাও দেখা যায়। যেমন আমাদের সমাজে খুবই জনপ্রিয় একটি প্রথা প্রচলিত আছে, যেটি প্রতি বছর উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়, যার নাম 'ভাইফোঁটা' বা 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বা 'ভাইদুজ'।

ওই দিন পুরুষদেরই আসনে বসিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অর্থাৎ অগ্নিসাক্ষী রেখে বোনেরা ভাইকে ফোঁটা দেয়, ভাইয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে। আমাদের সমাজে 'বোনফোঁটা' বা 'ভগিনীদ্বিতীয়া' বা 'বহেনদুজ' বলে কোনও অনুষ্ঠান আছে কি? ওই রকম একটি পুরুষকেন্দ্রিক সামাজিক প্রথা 'জামাইষষ্ঠী', যে অনুষ্ঠানে বিবাহিত পুরুষরা তাদের শাশুড়িদের কাছ থেকে রীতিমতো রাজকীয় সংবর্ধনা পায়, প্রায় পূজিত হবার মতো। এতদ্‌সত্ত্বেও বলতেই হবে যে এই প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে পুরুষকেন্দ্রিক। আমাদের সমাজে জামাইষষ্ঠীর মতো 'বধূষষ্ঠী' বলে কোনও প্রথা নেই বলে কি মহিলারা এবার কোর্টে ছুটবে?

শবরীমালা মন্দিরের যে নিয়মটি নিয়ে এত 'গেল গেল' রব, সেই নিয়মটি পালিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। তার জন্য কারও কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায়নি। মহিলাদের তরফ থেকেও কোনও অভিযোগ কেউ কোনওদিন শোনেনি। সুপ্রিম কোর্টে এই ব্যাপারে যিনি নালিশ জানিয়েছেন তাঁর নাম হচ্ছে নওশাদ আহমেদ খান যিনি একজন উকিল এবং 'ইন্ডিয়ান ইয়ং লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে, শবরীমালা মন্দিরের এই নিয়মটি আনকনস্টিটিউশান্যাল, অর্থাৎ সংবিধান-বিরোধী। কারণ কী? কারণ হলো— ভারতীয় সংবিধান মৌলিক অধিকারের তালিকায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছে, শবরীমালা মন্দির নারীকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে তার রাইট টু ইক্যুয়েলিটি লঙ্ঘন করেছে। অতএব ওই মন্দির সংবিধান-বিরোধী কাজ করে চলেছে, এর প্রতিকার হওয়া আশু প্রয়োজন। লক্ষণীয় বিষয় হলো যেটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কেবলমাত্র যে বয়সে মেয়েরা রজস্বলা হয়, সেই বয়সের মেয়েদেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ। দশ বছরের কম বয়সের মেয়েরা কি মেয়ে নয়? পঞ্চাশোর্ধ মহিলারা কি নারী নন? নাকি তাঁদের Menopause হয়ে গেছে বলে তারা পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন, তাঁদের জেন্ডার পাল্টে গেছে? তাঁরা সব ব্যাটাছেলে হয়ে গেছেন? তাদের জন্য তো কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না ওই মন্দিরে প্রবেশের ব্যাপারে, তাহলে? খানসাহেব হঠাৎ হিন্দু নারীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার নিয়ে এতটা ব্যাকুল হলেন কেন বোঝা গেল না। নাকি তিনি ডেভিড ম্যাকাচ্চিওনের মতো এ দেশের মন্দিরগুলি নিয়ে কোনও প্রকার গবেষণাধর্মী কাজে নিযুক্ত আছেন? বস্তুত কোনওটাই নয়। তাহলে একটি হিন্দু মন্দিরের রীতিরেওয়াজের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করছেন কেন? কী তাঁর উদ্দেশ্য? তাঁর এই ক্রিয়াকলাপ নিয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক নয় কী?

খানসাহেব হিন্দুনারীর সমানাধিকার রক্ষার জন্য দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ছুটে গেছেন, অথচ মুসলমান নারীর অধিকার নিয়ে, তাদের বঞ্চনা নিয়ে কোনোদিন সোচ্চার হয়েছেন কি? কোনও সুন্নি মসজিদে মুসলমান নারীর প্রবেশাধিকার নেই, সে ওখানে উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। মুসলমান নারী পর্দাপ্রথার শিকার, তাকে ঘরের বাইরে বেরোতে হলে আপাদমস্তক বোরখায় মুড়ে বেরোতে হয়, আজও সে মধ্যযুগীয় নিয়মকানুনের শৃঙ্খলে বাঁধা। শর্টস্ পরতে হবে বলে মুসলমান মেয়েদের ফুটবল, হকি এবং আরও অনেক খেলায় মোল্লাদের বাধায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না, মুসলমান পুরুষ বহুবিবাহ করতে পারে, ভারতীয় আইন তার বহুবিবাহের স্বপক্ষে। কিন্তু মুসলমান নারীর জন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, শরিয়া অ্যালাও করে না। আমাদের এই ওভার-পপুলেটেড দেশে মুসলমানদের জন্য 'হাম দো, হামারা দো' নীতি প্রযোজ্য নয়। তারা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারেও রক্তাল্পতায় ভোগা স্ত্রীদেরও রেহাই দেওয়া হয় না, কারণ এরা সংখ্যা বাড়ানোয় বিশ্বাসী।

দিল্লির জামা মসজিদে মুসলমান মহিলারা যে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, সে বিষয়ে খানসাহেব চুপ কেন? শুধু কি মসজিদ? মুসলমান পুরুষতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়কেও রেহাই দেয় না। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ও জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় যে মসজিদগুলি আছে, এর কোনওটিতেই মহিলাদের নমাজ পড়তে দেওয়া হয় না। এই বেলা খানসাহেবরা মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকেন কেন? এই বেলা সংবিধানের রাইট টু ইক্যুয়েলিটি তাঁদের মনে পড়ে না কেন? হিন্দু নারীর সমানাধিকার নিয়ে এদের কতই না মাথাব্যথা! ভাবুন কোনও হিন্দু যদি মসজিদের ওই ধরনের নারী-বিরোধী নিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় বা আদালতের দ্বারস্থ হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশ মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ হয়ে যাবে না কি? আসাদুদ্দিন ওয়েসি, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, তসলিম রেহমানি, ওমর আবদুল্লা, রণদীপ সুরজেওয়ালা আর এঁদের অনুগ্রহপুষ্ট তাঁবেদার কমিউনিস্টরা এবং তাদের এনজিও ভূষিত চ্যালাচামুণ্ডারা 'রে রে' করে তেড়ে আসবে।

ভারতে লক্ষ লক্ষ মন্দির বিদ্যমান, তার মধ্যে খুবই সামান্য সংখ্যক মন্দিরে লিঙ্গভিত্তিক প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত রীতি আছে, তাদের সংখ্যা এতই কম যে পার্সেন্টেজে আসে না।

মুসলমান নারী পর্দার অন্তরালে আজও কেঁদে চলেছে, খানসাহেব ও তাঁর সহযোগীরা ওই কান্না শুনতে পান না কেন? এই পৃথিবীতে একমাত্র মুসলমান সমাজেই নারী জাতিকে গৃহবন্দি করে রাখার নিয়ম প্রচলিত আছে। পর্দা প্রথার কারণে মুসলমান নারী-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, অ-মুসলমান নারীদের মতো স্বাভাবিক চলাফেরা এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হবার প্রয়াস মুসলমান পুরুষদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভারতের মুসলমান নারী কি ভারতের সংবিধানের বাইরে? নারী-পুরুষের সমানাধিকার কি এই নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? খানসাহেব, তাঁর সহচরবৃন্দ, নারীবাদীরা, তথাকথিত প্রগতিশীল লিবারেল ব্রিগেড এই ব্যাপারে কোনওদিন টুঁ শব্দ করেছেন? মধ্যযুগীয় পর্দাপ্রথা যা সর্বতোভাবে মুসলমান নারীর সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী, তার বিরুদ্ধে এঁরা সোচ্চার হন না কেন? ভারতের মতো সভ্য সমাজ, যে সমাজে পর্দার কোনও প্রয়োজন কখনও হয়নি, যে সমাজ নারীকে 'মায়ের জাত' বলে মনে করে এসেছে বরাবর, সেই সমাজের নারীকে মধ্যযুগীয় ইসলাম পর্দার অন্তরালে এক অসম্মানজনক অবস্থায় ফেলে রেখে সমাজকেই কলুষিত করেছে। আমাদের মহান সমাজ সংস্কারক— রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসুরা নারী সমাজের প্রকৃত বন্ধনমুক্তি ঘটিয়েছিলেন যেটা মুসলমান সমাজে হয়নি সংস্কারের অভাবে।

শবরীমালার ঘটনা থেকে এটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার যে, এই যে এত প্রতিবাদের ঘটা, সর্বোচ্চ আদালতে ছুটে যাওয়া সবটাই হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার একটি অপচেষ্টা মাত্র। হিন্দুধর্ম কী পরিমাণ নারীবিদ্বেষী, এটাই যেন প্রতিপাদ্য বিষয়। ভারতের বৃহত্তর নারী সমাজ এই ষড়যন্ত্রটা ধরে ফেলেছে। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুনারী শবরীমালা মন্দিরের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নিয়মের বিরোধিতা কখনোই করবে না, তাঁদের সামাজিক মর্যাদার দ্বারা কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ হবে না। এটা তাঁরা জানেন।

আসলে দেশে যে কোনও ছুতোয় একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে হবে, যাতে ২০১৯-এর নির্বাচনে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হঠানো যায়। এই ধরনের হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন খেলা সম্ভবত আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এর সঙ্গে মানবাধিকারের কোনও সম্পর্ক থাকবে না, কারণ সবটাই রাজনৈতিক চক্রান্ত। অতএব সাধু, সাবধান! ■

ভগিনী নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতা এবং নিবেদিতা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

গত ২৬ অক্টোবর উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে সিস্টার নিবেদিতা মিশন ট্রাস্টের উদ্যোগে এই বছরের নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতা এবং নিবেদিতা সম্মান ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এ বছরের নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর সহাধ্যক্ষা নিবেদিতা ভিড়ে। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিরিটি-র প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা মাতাজী। প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, বর্তমান ভারতের যুব সমাজকে ভগিনী নিবেদিতার জাতীয়তা বোধের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তবেই এ দেশ সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে। নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতায় নিবেদিতা ভিড়েও স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার আদর্শে দেশ গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, দেশের ভিতরেই একটি অংশ চক্রান্ত চালাচ্ছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিবেদিতার আদর্শই প্রকৃত হাতিয়ার হতে পারে। এ বছরের নিবেদিতা সম্মান প্রদান করা হয় মেদিনীপুরের সারদা কল্যাণ ভাণ্ডারকে। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এগারো জন ছাত্র-ছাত্রীকে একনাথ রানাডে পুরস্কার প্রদান করা হয়। চারজন ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয় সিস্টার ক্রিশ্চিনের নামাঙ্কিত পুরস্কার। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রগীত পরিবেশন করেন ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন সিস্টার নিবেদিতা মিশন ট্রাস্টের সভাপতি অসীম কুমার মিত্র।

সুইডেনের লিংকপিং শহরে দুর্গাপূজা

সুইডেনের লিংকপিং শহরে প্রবাসী বাঙ্গালিদের উদ্যোগে প্রথমবর্ষের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেদেশের আইন অনুসারে ১৩-১৪ অক্টোবর দু'দিনে পূজা সমাপন হয়। বাঙ্গালিদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষরাও পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ৪০০ মানুষ পুজোয় প্রসাদ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সুইডেনের অন্যান্য শহর থেকেও কিছু বাঙ্গালি পরিবার

উৎসবে যোগদান করেন। ৪০০ মানুষের মধ্যে ৮০ ভাগ অবাঙ্গালি প্রবাসী ভারতীয়। পুজোর দু'দিন নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলাকুশলীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছিলেন। পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা সুইডেনের লিংকপিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক বিপ্লব পাল বলেন, দু'দিন লিংকপিং শহর যেন ভারতবর্ষের ছোটোরূপ ধারণ করেছিল। এই শহর ছাড়াও সুইডেনের আরও কয়েকটি শহরে বেশ কয়েক বছর ধরে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। যেমন আপসালা শহরে সান্যালবাড়ির পুজো, দক্ষিণ সুইডেনের 'বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি অব সাউথ সুইডেনের পুজো, স্টকহোমে এবার প্রথম পুজো। দক্ষিণ সুইডেনের গোথেনবার্গ শহরের পুজো।

লক্ষণীয়, প্রবাসী বাঙ্গালিরা প্রবাসে দুর্গাপূজার মাধ্যমে 'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্' সার্থক করে চলেছেন।

দমদমে চক্ষুপরীক্ষা শিবির

গত ২৭-২৮ অক্টোবর কলকাতার দমদম গীতাদেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা, বিনামূল্যে চশমা দান ও বিনামূল্যে চক্ষু-অপারেশন শিবির। পরিচালনা ও উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ সেবা ভারতী, পাইকপাড়া ও ড. বি. আর. আম্বেদকর সেবা

সংস্থান। পাঁচশোর বেশি মানুষকে এই পরিষেবা প্রদান করা হয়।

এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন 'শঙ্কর নেত্রালয়'-এর চেয়ারম্যান তথা বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের অন্যতম উপদেষ্টা ভগবতী প্রসাদ জালান, ভারতবিখ্যাত শিশু চিকিৎসক ড. ভাস্করমণি চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ সেবাভারতীর সভাপতি ডাঃ কল্লোল দাঁ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর ভাগ সঙ্ঘচালক বিশিষ্ট আইনজীবী পরমানন্দ শর্মা, কলকাতা মহানগর কার্যবাহ শশাঙ্ক শেখর দে প্রমুখ। শিবিরে ১৬০ জন রুগীকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয় এবং ১০৬ জনের ক্যাটারাক্ট অপারেশন শংকর নেত্রালয়ে বিনামূল্যে করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্গাপঞ্চমীতে পাণ্ডুয়ায় বস্ত্র বিতরণ

গত দুর্গাপঞ্চমীতে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াতে স্বামী বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্ট এবং সাইকোনিউরোথেরাপি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের যৌথ উদ্যোগে ৮০ জন দুঃস্থ ছেলে-মেয়ে ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে জামা-কাপড়- শাড়ি দান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সঞ্জয় দেব, সদানন্দ কুমার, নৃসিংহ প্রসাদ দে প্রমুখ। এতে সহযোগিতা করেন রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, সমাজসেবী রামকৃষ্ণ শর্মা ও সুভদ্রা শর্মা।

ইতিহাস সংকলন যোজনার অভ্যাসবর্গ

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রীয় অভ্যাসবর্গ অনুষ্ঠিত হয় গত ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার কল্যাণ ভবনে। এই দু'দিন ব্যাপী যোজনায় ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাদেশিক কর্মসমিতির চল্লিশজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ড. বালমুকুন্দ পাণ্ডে এবং পূর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক কমলেশ দাস সম্পূর্ণ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। এই বর্গে ইতিহাস সংকলন সমিতির কর্মপদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো, ইতিহাস চিন্তা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়। জনজাতির ইতিহাস, পুরাণ অন্তর্গত ইতিহাস, কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাস, জনবাদের ইতিহাস ইত্যাদি মিলিয়ে এই সভায় আলোচনা হয়।

বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উদ্‌যাপন

গত ৭ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটিতে প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ অব বেঙ্গলের উদ্যোগে বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষ্যে প্রথমে জনবহুল নৈহাটি স্টেশনে প্রচার অভিযান এবং পরে বিকাল ৪টায় নৈহাটির বিজয়নগরে 'দেবী নিবাস'-এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলার অনেক প্রবীণ মানুষের উপস্থিতিতে জেলার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সুনাম দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাজ্য সম্পাদক অশোক কুমার দাস এবং রাজ্য সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দে প্রবীণ নাগরিক দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রবীণ নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত জীবন তাদের সম্মানজনক সুরক্ষিত জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাগরিকদের সুষ্ঠু জীবনের জন্য অপরিহার্য একটি দাবিসনদ প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা শিল্প

চূড়ামণি হাটি

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বংশপরম্পরায় শেখা নিজস্ব ঘরোয়া প্রযুক্তিতে নানা ধরনের লোকশিল্পগুলির উদ্ভব ঘটেছে। প্রয়োজন বোধ থেকে এবং পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনকে অতিক্রম করে গুরুত্ব পেয়েছে শিল্প-সৌন্দর্য। সহজলভ্য উপকরণকে কাজে লাগিয়ে লৌকিক প্রযুক্তিতে ফুটে ওঠে আদি-আঞ্চলিক ঐতিহ্যাশ্রিত রূপ। ডোকরা হলো অরণ্য দ্বারা প্রভাবিত ঐতিহ্য। পায়ের ঘুঙুর, ঘুঙুর বাঁধা মাথার কাঁটা, বালা অঙ্গুরীয়, ঝুমকো কানের এবং জীর্ণ চেহারার নৃত্য-গীত মডেলগুলি বনবাসী ভঙ্গিবোধের ইঙ্গিত দেয়। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঠ, ধুনো সবই অরণ্য-নির্ভর উপকরণ। কিন্তু অন্যান্য লোকশিল্পের মতো এ শিল্পের মূল উপকরণটি সহজলভ্য নয়। পিতলের সন্ধানে এই শিল্পগোষ্ঠী কাঁধে বাঁক নিয়ে যাযাবর। ধাতু ব্যবহারের ইতিহাসে তামার ব্যবহার সবচেয়ে প্রাচীন। তামা ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি পিতল। এই শিল্পের শিল্পীরা পুরনো পিতল সংগ্রহ করে তাকেই ভেঙে ভেঙে চিনামাটির পত্রমুচিতে রেখে আগুনের তাপে গলিয়ে কাজে লাগান। কাঁচামালের সন্ধানের পাশাপাশি ফাঁপা পিতলের অদ্ভুত এই শিল্পবস্তুটির চাহিদার সন্ধানেও এরা দিকে দিকে ঘুরে বেড়ায়। একদিকে হতচ্ছাড়া জীবন; অন্যদিকে এই কষ্টসাধ্য শিল্প প্রক্রিয়াটি। তাই তারা বারে বারে ভেঙে পড়ে। কিন্তু লড়াই চলে। বিদেশ থেকে ডাক আসে শিল্পবিদ্যাটি উপস্থাপনার জন্য।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে হঠাৎ আশা এক বিনয়ী বুড়োকে 'ডোকরা বামন' শব্দদ্বয় দ্বারা চিহ্নিতকরণ নীচ-আগন্তুক কোনও সমাজের ইঙ্গিত বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে এই বুনোরা বাধ্য হয়েই শাস্ত্রীয় ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আবার তাদের অপূর্ব শিল্পকর্ম দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হয়েছে। হিন্দু সমাজের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে হাতির পিঠে লক্ষ্মী বা নানা দেব-দেবীর মূর্তি এবং সংসারের প্রয়োজনীয় প্রদীপ, কুনকে, কাজললতা ও ঘর সাজানোর নানা জিনিস। নানা ধরনের গহনা তো রয়েছেই। সারাদিনের খাওয়া এবং সামান্য কিছু চাল-ডালের বিনিময়ে এরা গৃহস্থের পুরনো পিতল গলিয়ে তৈরি করে দিতেন এরকম নানা প্রয়োজনীয় জিনিস। এরকম অল্প পারিশ্রমিক নিয়েই মালারু ভাষাগোষ্ঠীর মালহার সম্প্রদায়ের উড়িয়া ডোকরা স্যাকরা-কামাররা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতেন গ্রাম থেকে গ্রামে। এই যাযাবর জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের সূচনার ইতিহাসটি। বলা হয় ছত্তিশগড়ের বস্তারের ঘড়য়ারা কিংবা ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ অঞ্চলের ঘুংঘুর ধরারাই পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় হয়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমানে প্রবেশ করেছিল। ওড়িশার মিথরিয়ারাও যাযাবর জীবন নিয়েই হঠাৎই এসেছিল। যাইহোক, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার বিক্না এবং বর্ধমানের গুসকরার কাছে দড়িয়াপুর-সাধুরবাগানের ডোকরা কর্মকার শিল্পীরা বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। এছাড়াও ডোকরা শিল্পীরা ছড়িয়ে আছেন পুরুলিয়ার নডিহা, নরকলি, অক্রা; মেদিনীপুরের লালগড়, গড়বেতা; বাঁকুড়ার

লক্ষ্মীসাগর, নেতকমলা, বিন্ধ্যজাম, পাত্রসায়র; বর্ধমানের একলক্ষ্মী ও শক্তিগড়ে। এই গ্রামগুলিতে হাতেগোনা কয়েকটি পরিবার। তাদের এই স্থায়ী বসতির পেছনে জমিদার বাড়ির সংস্পর্শ কিংবা যাযাবর জীবন থেকে মুক্তির ইচ্ছার গল্পটি জড়িয়ে। আজ তাদের পাড়ায় বড় বড় গাড়ি ঢোকে। লোকজন ভিড় করে। তবুও অভিযোগ তাঁরা ঠিক দাম পান না। কর্মজীবনে রোগে পড়লে রক্ষে নেই।

মোম গলানো ঢালাই রীতিতে তৈরি এই শিল্পকর্ম। একদিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করা লাল মাটি বা বালি মিশ্রিত ঝুড়ো মাটি দিয়ে প্রয়োজনীয় শিল্প বস্তুটির মূল গঠনটি তৈরি হয়। পাশাপাশি চলতে থাকে এই মূল গঠনটিকে মুড়ে ফেলার জন্য পিচ-ধুনো কিংবা মোম-ধুনো-তেলের মণ্ড তৈরির কাজ এবং মূল গঠনটিকে অলঙ্কৃত করার জন্য ব্যবহৃত মোমের সুতো তৈরির কাজ। মৌমাছির মোম ও ধুনো ভালো করে পিষে সেটিকে গরম জলে ফুটিয়ে কাপড়ে ছেঁকে তা দিয়ে মোমের সুতো প্রস্তুত হয়। কাঠের পাটাতনে চাপ দিয়ে দিয়ে যেমন সুতো প্রস্তুত হয় তেমনি অসংখ্য ছিদ্র যুক্ত চোঙ ও একটি দণ্ডের সাহায্যে তৈরি জাঁত-পুঙ্গির সাহায্য নিয়েও সুতো প্রস্তুত হয়। মোম-ধুনো-তেলের মণ্ডটি তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে গুঁড়ো ধুনো খোলায় ভেজে নরম করে তেল মিশিয়ে পরিমাণ মতো মোম মেশানো হয়। তৈরি করে নেওয়া হয় কালো ফিতে। এর বদলে পিচের ব্যবহারও রয়েছে। এ সবের ব্যবহারেই মূল গঠনটি পূর্ণতা পায়। মাটির মূল গঠনের উপর এগুলির প্রলেপ বা প্রয়োগ ঘটিয়ে তৈরি নিখুঁত ছাঁচ-মডেলটি। আঙুলের আলতো চাপে কিংবা কাঠির সাহায্য নিয়ে শিল্পবস্তুটির গঠন ও অলংকরণ স্পষ্ট করা হয়। প্যাংলা চেহারায় সূক্ষ্ম কারুকার্য নিয়ে ফুটে ওঠে ঐতিহ্যাশ্রিত শিল্পচর্চায় বনবাসী মন। এরপর ওই ছাঁচ-মডেলটিকে আঠালো নরম মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অনেক সময় যাতে ফেটে না যায় তার জন্য তারের খাঁচা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়। চাপানো হয় গুঁড়ো মাটি। রাখা হয় কয়েকটি ছিদ্র এবং উপর দিকে মাটি দিয়ে তৈরি করে নেওয়া হয় নলাকৃতির বড় ছিদ্র পথ। এই সম্পূর্ণ অংশটি রোদে শুকিয়ে খুব যত্ন করে কয়লার আগুনের সংস্পর্শে আনা হয়। আগুনের তাপে ধুনো-মোম বা পিচ গলতে থাকে। বেরিয়ে আসে ছিদ্র পথ ধরে। ভেতরে তৈরি হয় শূন্যস্থান। ছোটো ছোটো ছিদ্রপথগুলি কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করা হয়। ওপরের বড় নলাকৃতির ছিদ্র পথে ঢালা হয় তরল পিতল, তাদের ভাষায় 'ঘৈরা'। ছাগলের চামড়ার হাপরের হাওয়ায় কয়লার আগুন গনগনে করে মুচিতে রাখা পুরনো ভাঙা পিতল গলানো হয়। বড়ো সাড়াশি দিয়ে ধরা হয় ছাঁচ মডেলটি আর বড়ো হাতলযুক্ত ডাবুইয়ে করে তরল পিতল তুলে এনে ঢালা হয়। পূরণ হয় শূন্যস্থানটি। পরে জলে ডোবানো হয়। সবেশেষে মাটির আররণটি ভেঙে বের করে নেওয়া হয় শিল্প বস্তুটি।

কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তৈরি মাটির মূল গঠনটি থেকে যায় তারও ভেতরে। অলি গলি খুঁজে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করা হয় মাটির ওই পুরটি। যে কারণে এই ধাতু শিল্পগুলি ফাঁপা। এই শিল্পের হালকা কালচে রং অনেকেরই পছন্দ। আবার অনেকে খোঁজে উজ্জ্বল রং। সেক্ষেত্রে শিরিষ কাগজ ঘষে পালিশ করা হয়। স্ত্রী-পুরুষ মিলে সবাই ব্যস্ত এই শিল্পকর্ম নিয়ে। ছোটোরাও। বর্তমানে তারা শহরের বাবুদের উপর বড্ড বেশি নির্ভরশীল। শহর থেকে ক্যাটালগের ডিজাইন ফুটিয়ে তুলছেন নিজস্ব আঙ্গিকে। তৈরি হচ্ছে জাল নক্সাকে গুরুত্ব দিয়ে কচ্ছপ, হাতি, ঘোড়া এবং তার পিঠে মোমবাতি স্ট্যান্ড, একটু অন্য ধরনের দেওয়াল ঘড়ি, নানা গহনা, পালকি থেকে ফিটন ঘোড়ার গাড়ি। গ্রামাঞ্চলে বরঞ্চ এর চাহিদা অনেক কমেছে। ধর্মীয় চাহিদা কমেছে। বরঞ্চ আকর্ষণীয় হয়েছে নাকে জলপড়া প্যাঁচা কিংবা কানের দুল পড়া হাতির দল কিংবা মহিলাদের কর্মজীবনের নানা মুহূর্ত। সুতো ঘুরে ঘুরে ওঠার সৌন্দর্য, সাদামাটা চেহারার সৌন্দর্য, সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম রসবোধই এ শিল্পের আকর্ষণ। এই শিল্পকর্মের পাশাপাশি নাগ গোত্রের ডোমার উপজাতি উৎসব-অনুষ্ঠান দেখাশোনা করেন, কচ্ছপ গোত্রের বান্‌থারা উৎসবের উপকরণের জোগাড় দেন, বাঘ গোত্রের চোরবন্দিরা অতিথি আপ্যায়ন করেন, কর্কট গোত্রের কুলিয়াররা বিচারক।

যাইহোক, দেশ-বিদেশে ডোকরা শিল্প বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু গ্রামের এই দরিদ্র শিল্পীরা ধনী মানুষের সংস্পর্শে থাকা বাজারগুলিতে তাদের শিল্পবস্তু পৌঁছে দেওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ীদের উপরই বড্ড বেশি নির্ভরশীল। অবশ্য বর্তমানে কিছুটা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ওই গ্রামগুলিই হয়ে উঠেছে পর্যটনকেন্দ্র। শিল্পীর কণ্ঠ ও শিল্পমাধুর্য ক্যামেরাবন্দি হয়ে প্রচারের মুখ দেখেছে। শিল্পীরা ভালো কিছুর আশায় আছেন। ▮

পরম্পরা

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

কার্ল. জি. জুং : (১৮৭৫-১৯৬১)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত। এছাড়াও তিনি ছিলেন এক প্রভাবশালী চিন্তাবিদ এবং বিশ্লেষণাত্মক মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ। তাঁর বিশেষ অবদানটি হলো, 'জুঙ্গিয়ান মনোবিদ্যা'-র সৃষ্টি। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্র, কিমিয়া বিদ্যা, জ্যোতিষ, সমাজতন্ত্র, সাহিত্য এবং কলা বিষয়ে অনুসন্ধান।

উদ্ধৃতি : ভারতীয় এবং চীনাদের মহান ও কালজয়ী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং বিকশিত হয়েছিল তাদের নিয়ন্ত্রিত আত্মজ্ঞানের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। এটা আরও পরিশুদ্ধ হয়েছিল দৈনন্দিন জীবন ও দর্শনে তার প্রয়োগের ফলে।

উৎস : হিন্দু কালচার— কে. গুরু. দত্ত।

উদ্ধৃতি : আমরা এখনও সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি যে পাশ্চাত্যের ধর্মজ্ঞান শুধু মাত্র প্রাচ্য প্রজ্ঞার অপেশাদারি অনুকরণ।

উৎস : মডার্ন ম্যান ইন সার্চ অব আ সোল— কার্ল গুস্টাভ জুং।

জোসেফ ক্যাম্পবেল : (১৯০৪-১৯৮৭)

পরিচিতি : তিনি ছিলেন আমেরিকার অন্যতম লেখক, অধ্যাপক এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর তুলনামূলক ধর্ম এবং পুরাণ বিষয়ের কাজের জন্য। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি ছিল, 'দ্য হিরো উইথ এ থাউসেন্ড ফেসেস'। তাঁর প্রাচ্যপ্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত রচনা ও ধ্যানধারণা পাশ্চাত্যের বহু লেখক, চিন্তাবিদ এবং শিল্পীর কাজকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

উদ্ধৃতি : স্বরূপ রহস্য হলো পরম সত্য। যোগ পরম সত্যের সঙ্গে চৈতন্যস্বত্বার সেতুবন্ধন করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে পরমেশ্বরের জ্যোতিস্বরূপ। আমরা তাঁর মধ্যেই আছি এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের যেমনই দেখাক না কেন, আমরা সকলেই তাঁর অংশ— এই জ্ঞানই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা।

উৎস : জোসেফ ক্যাম্পবেল ফাউন্ডেশন।

উদ্ধৃতি : ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম শিক্ষাই হচ্ছে, পরমেশ্বর ভাষায় অবর্ণনীয়। তাঁকে কেবলমাত্র উপলব্ধির দ্বারা জানা যায়, যখন চঞ্চল মন স্থির হয়। আর যার একবার উপলব্ধি হয়েছে, তিনি কাউকেই তার অভিজ্ঞতার কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। সেই স্বত্তা হলেন পরম সত্য, তিনি তুরীয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের অতীত— সব ভাষা ও সব আকারকে অতিক্রম করে যায়।

উৎস : লিটারারি ইন্ডিয়া— প্যাট্রিক কোম্‌হোগান, ললিতা পণ্ডিত।

জর্জ হ্যারিসন : (১৯৪৩-২০০১)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ইংরেজি সুরজগতের বিখ্যাত সংগীতকার, সুরকার, গায়ক এবং বিট্‌লসদের অন্যতম নায়ক ও গিটারবাদক। তিনি সনাতন ধর্মের দুই মহারথী, হৃষীকেশে মহাঋষি মহেশ যোগী এবং ইংল্যান্ডে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর, প্রাচ্যের প্রজ্ঞা এবং ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতি গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হন। তিনি ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের দ্বারা বিমুগ্ধ হয়ে বিশ্ববিখ্যাত সেতারবাদক রবিশঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

উদ্ধৃতি : প্রাচ্যের প্রজ্ঞার দ্বারা নিজেকে উন্নত অনুভব করি। এখন আমি আরও বেশি আনন্দিত আর সুখী হয়েছি। আমি অনুভব করতে পারি, আমি বিধিনিষেধহীন হয়েও নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখেছি।

উৎস : 'অল থিংস মাস্ট পাস— দ্য লাইফ অব জর্জ হ্যারিসন'— মার্ক সাঁপিরো।

উদ্ধৃতি : ভারত এবং তার প্রজ্ঞা আমার চেতনারাজ্যের বিশাল দরজাটি উন্মোচিত করেছে।

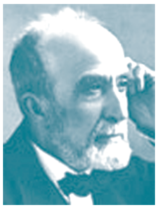

স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস : (১৮১৯-১৯৯৯)

পরিচিতি : তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এবং এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। তিনি মহাকবি কালিদাস বিরচিত শকুন্তলা নাটিকাটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত ইংরেজি- সংস্কৃত এবং সংস্কৃত-ইংরেজি শব্দকোষ দুটি তাঁকে বিশেষ প্রসিদ্ধি এনে দিয়েছে।

উদ্ধৃতি : আমাকে যদি কালের সীমা অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে আমি বলবো, হিন্দুরা ছিল ঠিক 'স্পিনোজাবাদী'দের মতো, তবে 'স্পিনোজা'র আবির্ভাবের ২০০০ হাজার বছর পূর্বে এবং 'ডারউইনবাদীর মতো, তবে 'ডারউইন' আসার বহু শতাব্দী পূর্বে। অবশ্য আমাদের সময়ের বিজ্ঞানীদের প্রবর্তিত প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের আগেই কিন্তু হিন্দুরা এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে।

উৎস : দ্য ইনার টিচিংস অব দ্য ফিলোসফিস অ্যান্ড রিলিজিওনস্ অব ইন্ডিয়া— যোগীরাম আচার্য্য।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁড়ুলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)
অনুবাদক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাস

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

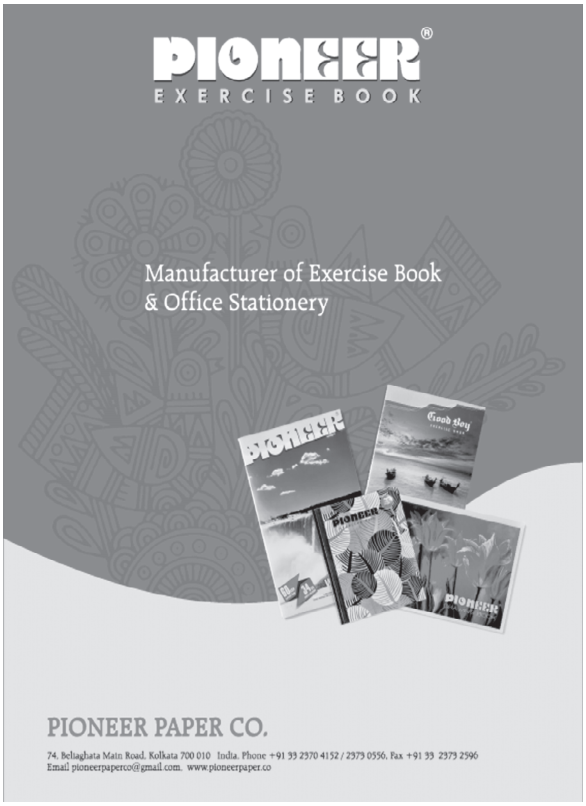

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

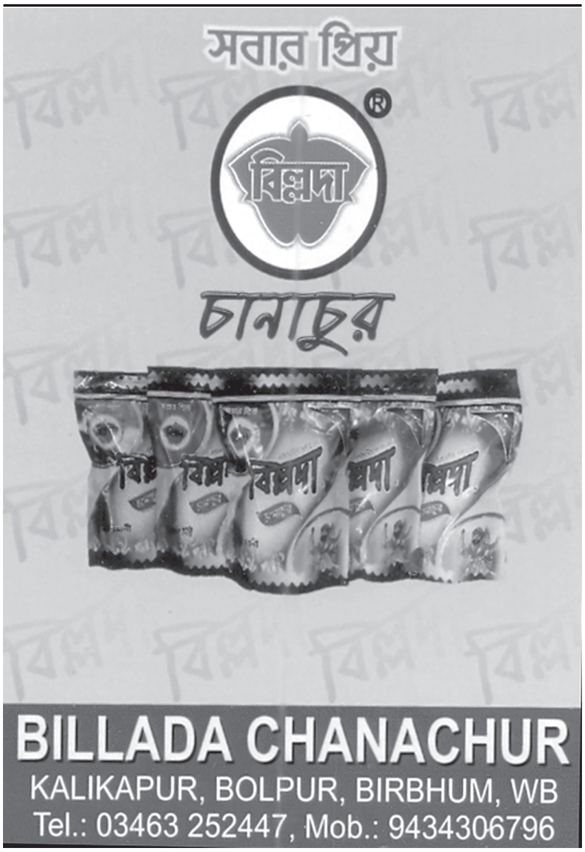

গল্প

হাতছানি

শেখর সেনগুপ্ত

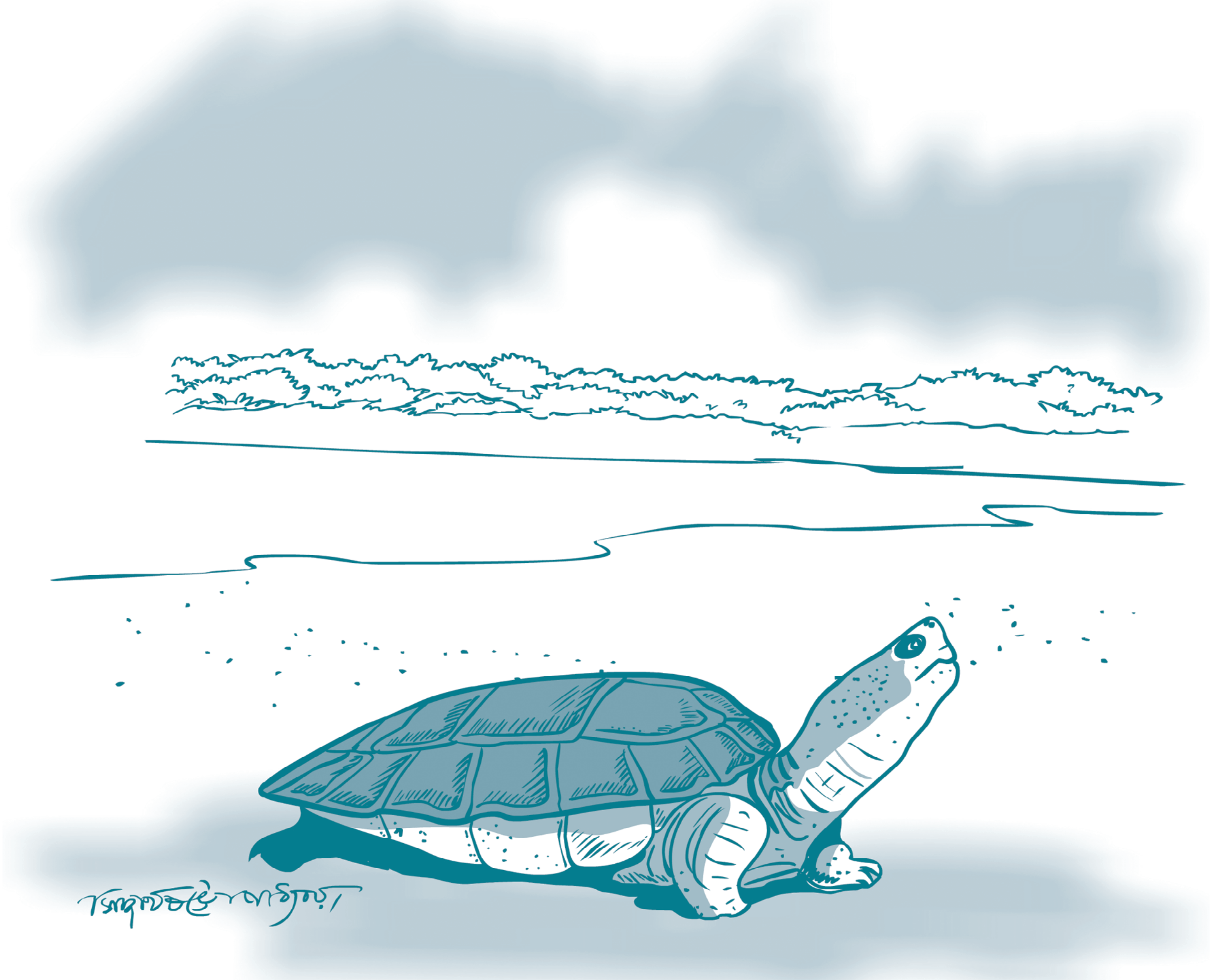

সুন্দরবনের কিছু দ্বীপকে আজও অরক্ষণীয়া বলা চলে। এরকমই একটি জল-ঘেরা ভূখণ্ড ডুবঢাকা। দ্বীপটা সুখেনকে মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখা দেয়। অথচ গত একদশকে সে তিনবার কন্যাকুমারী ছুঁয়ে এলেও ডুবঢাকায় বারেকের জন্যও ঢুঁ মেরে আসেনি। যখনই যাবে ভেবেছে, দুরাচারী অফিস তাকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতের অন্য কোনও প্রান্তে। অবস্থাগতিকে ও যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে একজন পদস্থ ব্যাঙ্ক আধিকারিকের এরকম দশা হতেই পারে।

আজ আর সেই বাধ্যবাধকতা নেই। সাংসারিক দায়ও এখন হালকা। স্ত্রীকে শান্ত করে টুপ করে ডুব দিয়ে মাথা তুলেছে কচুবেড়িয়ার কূলে। খানিক আগেও আকাশে যে কালির পোঁচ ছিল, এখন তা মুছে যাওয়ায় লক্ষণীয় হয়েছে প্রকৃতির মনোরম হাসি।

লঞ্চ নয়, নৌকা ভাড়া করল সুখেন। রেডিয়ামভেজা হাতঘড়িতে এখন মধ্যবেলা। ঘড়িটা দিয়েছিল তাকে বিদায়বেলায় সহকর্মীরা, ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকেও পাওয়া গিয়েছে বিস্তর কমপ্লিমেন্টস— এরকম পোড়-খাওয়া আধিকারিকদের সংখ্যা নাকি ক্রমেই কমে আসছে বাণিজ্যিক

ব্যাঙ্কগুলিতে। ডুবঢাকার দিকে যাচ্ছে নৌকা। একবার থেমেছিল গোসাবায়। তখন প্যাকেটবন্দি খাস্তা কচুরিগুলিকে উদরে চালান দিয়েছে সুখেন। চারিদিকে নোনা জলের আছাড়ি-পিছাড়ি। ব্যাকরণ মেনে তাই দু' বোতল জলের আবশ্যিক সংযোজন সুখেনের সাইডব্যাগে। কপালের ভাঁজগুলি গভীরতর হয়। চলতে ফিরতে কত রকমের বিজ্ঞাপন যে দেখতে পায়। সর্বত্র সেই এক চঞ্চল ও সোচ্চার ঘোষণা— অনুপ্রাণিত উন্নয়নে বিলকুল বদলে গিয়েছে আজকের সুন্দরবন। এখন নাকি নিরাপত্তার বলয়ে সুন্দরবনের মানুষ বড় সুখে আছে! সুখেনের নজরে তেমন কোনও পরিবর্তন ধরা দিল না। কোথাও কোথাও দু' একটা বাঁধ নজরে এলেও তাদের মজবুতি নিয়ে সন্দেহের খোঁচা বিব্রত করে।

সবচেয়ে অখুশি হলো ভারী শরীর ও হাঁটুব্যথা সামলে ডুবঢাকার মাটিতে পা রেখে। তার কাঁধে যে স্পন্ডিলাইসিস, সেটাও টের পেল। চাহনি যে দিকেই ছুটুক, অবস্থা পূর্ববৎ। এক দশক আগে চশমার তল দিয়ে যে মানুষগুলিকে সে দেখেছিল, তারা সকলেই যেন একই জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। নেই কেবল একজন— পরশুরাম ধুম। সে ইতিমধ্যে দুনিয়ার জার্নিতে ছেদ টেনে লাগেজ গুছিয়ে ভিন্ন ধামে থিতু হয়েছে নির্বিঘ্নে। কেবল পরশুরাম নয়, রহস্যজনকভাবে বেপাত্তা পরশুরামের ছেলে হরিনাথ ধুমও। বাপ-বেটা কোনও দিন ক্যানিং-কাকদ্বীপ দেখেনি, কলকাতা দূরের কথা। বাপ গত হবার আগেই হরিনাথ উধাও হয়, আর তাতেই নাকি হাহাশ্বাস ফেলতে ফেলতে পরশুরামের মৃত্যু। সুখেনকে বৃত্তান্তগুলি যে দিল, সে দ্বীপের অতি প্রবীণদের একজন। মুখে রাশি রাশি বলিরেখা, কপালে সেই তুলনায় ভাঁজ কম। কানে কম শোনে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। কিন্তু এত বছর বাদেও ব্যাঙ্কের বাবুকে চিনতে ভুল করেনি। ছোটো ছোটো কিছু ঋণ এই লোকটাই এক সময় দ্বীপের কয়েকজনকে দিয়েছিল। ঋণের নাম ডি. আর. আই.। সুদের হার অবিশ্বাস্য রকমের কম— শতকরা মাত্র চার! ঋণ তারা পরিশোধ করেছিল কিনা, জানবার আগ্রহ নেই সুখেনের। পরশুরাম ও হরিনাথের বিবরণ শুনতে শুনতেই সে যেন কাঠপুতুল।

হরিনাথের উধাও হবার ঘটনাটা অদ্ভুত। বাকচাতুর্যে সড়গড় শহুরে মানুষ এর তাৎপর্য বুঝবে কিনা, সন্দেহ। স্মৃতিতে পোক্ত হয়ে-থাকা হরিনাথই বেশি জীবন্ত। তারুণ্যে ভরপুর, রং তামাটে, নির্মেদ এবং বেশ লম্বা।

'হরিনাথ, তুমি কখনও কলকাতায় গিয়েছ?'

'না। ওই নাম শুনছি। যাইতে মন লাগে। যদি কেউ পাঁজাকোলা কইরা লইয়া যায়, বড় ভালো হয়।'

'লেখাপড়া কতদূর?'

'কিচ্ছু না। কিছু দিন গোসাবার স্কুলে গেছি। হ্যামিলটন সাহেবের মূর্তিরে পেন্নাম করছি। ব্যাস, তারপর দিলাম ছাইড়্যা। আমার মা নাই। তাই বাবারে একটু সাহায্য করি।'

হরিনাথের বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি কথা বলে হেসে হেসে। দেখলে মনে হবে, সে নিশ্চয় এই দ্বীপে বেশ নিরুপদ্রবে দিন কাটায়।

'বাবাকে তুমি কীভাবে সাহায্য কর?'

'বাবা ধরে কাঁকড়া। আর আমি ধরি কাছিম। বাবার কাছ থিকা মহাজনরা আইসা কেনে। টাকা দেয়, চাউল-ডাল-নুন-আলুও দেয়। হে-হে...'।

একটু থেমে হরিনাথ বলেছিল, 'কিন্তু স্যার, একটা কথা কই, আমি কিন্তু বাবারে সব কাছিম বেঁচতে দেই না। কিছু কাছিম আছে, যাদের আমি ছাইড়্যা দেই। এছাড়া এমন একটা কাছিম আছে, যারে আমি সোহাগ করি। আপনারে আমি দেখামু একবার।'

হরিনাথ এও জানিয়েছিল, কাছিম ও কাঁকড়া জলের দরে কিনতে কারা অতটা জলপথ উজিয়ে এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপ চষে বেড়ায়। একেবারে প্রথাবদ্ধ শোষণ। বলবার সময় হরিনাথের বীতরাগ চাপা থাকেনি। প্রতিবাদ, প্রতিরক্ষার কোনও হাতিয়ার এদের নেই। ভোট ঘনিয়ে এলে নেতারা আসেন। বাতাসে ওড়ে 'ফাঁকা প্রতিশ্রুতি।

সেদিন হরিনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা খালের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সুখেন। খালটি দুরন্ত খরস্রোতা। রোজকার নিয়ম মেনে জোয়ার-ভাঁটায় সাড়া দেয়। কুমির যেমন আছে, কাছিম-কাঁকড়াও আছে। কাছিমের সাহস বেশি অথবা মানুষের ঘরোয়া জীবনের প্রতি তাদের কৌতূহল বেশি। তাই ওরা অনেক সময় ছোটো-বড়ো দল বেঁধে উঠে আসে আহাম্মকের মতো, তাড়া খেয়ে হেথাহোথা বাগ বাগিচায় আত্মগোপনের বৃথাই চেষ্টা করে। হিসাব মোতাবেক বড় কাছিমের সংখ্যা কম, কিছু বাঁধা নিয়েমে ওরা বেশিদূর এগিয়েও যায় না। চটজলদি ফিরে আসে খালে। যত বিপদ খুদেগুলির। এক বস্তা ছোট কাছিম বেচতে পারলে পরশুরাম ধুম খুব খুশি। এক সপ্তাহ আর পেটের ভাবনা থাকছে না। বাপ-বেটায় স্বপাক আহার। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দ্বীপের ইতিউতি ঘুরঘুর ঘুরঘুর।

ওই দিন হরিনাথ সুখেনকে মোট তিনটি অতিকায় কচ্ছপ

দেখিয়েছিল। তিনটির মধ্যে দুটোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয়টি স্বাধীন, ঘুরছে-ফিরছে। হরিনাথের গায়ের গন্ধ নাকে যেতেই তার দিকে ছুটে আসে। লম্বায় অন্তত ষাট সেমি। ওজন যে কত, হরিনাথই বলতে পারে। পিঠের দিকের রং মেটে বাদামি আর পেটের দিকটা হলুদ-কমলায় মেশানো। হরিনাথ কাছিমটাকে কোলে তুলে নেয়, চুমু খায়, সুখেনের দিকে তাকিয়ে আবেগের সঙ্গে বলে— ‘খুব ভারী। ওজন কুড়ি কেজির কম না। জাতে হইল সিলেটি কড়ি কাইট্টা। সারা দুনিয়ায় এদের সংখ্যা খুব কম। যুগলে আইছিল। মরদটা পালায়। বউটা ধরা পড়ে। এখন ওটা আমার। আমি ওর নাম দিছি শীলা। নিজে হাতে খানা খাওয়াই। ও আমার প্রেমে...হে-হে-হে...’।

সুখেন আরও শুনল, ওই কড়ি কাইট্টাকে কিনবে বলে একজন লোক নাকি হাজার টাকা দর দিয়েছিল পরশুরামকে। হরিনাথ রুখে দাঁড়ায়। বাপ-বেটাতে সেদিন প্রায় কুরুক্ষেত্র।

বুড়োর মুখ থেকে বৃত্তান্ত শুনছে সুখেন আগ্রহ নিয়ে। কোনও লোককেই সে তুচ্ছ ভাবে না। ঘটনার ঘনঘটা কূল ছাপিয়ে আসে। এমনকী বোঁচকা সম্বল করে যারা কলকাতার ফুটপাথে বা ওভারব্রিজের তলায় রাত কাটায়, তাদের প্রত্যেকের একটা করে ইতিহাস আছে। প্রত্যেকেরই বাস্তু ছিল, হয়তো বাস্তুসংলগ্ন ঝোপঝাড়ও ছিল। সুখেনের বাসনা, এতকাল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের টাকাপত্র ঘাঁটবার পর এবার সে এই সমস্ত নগণ্য অবহেলিত মানুষদের নিয়ে লেখালেখি করে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দেবে। বক্তা প্রবীণ লোকটির রোগা-সিড়িঙ্গে দেহে নোনা জলের চিহ্ন, ফিক ফিক ফোকলা হাসি হেসে বলল, ‘হরিনাথ ওই মাদি কাছিমটারে নিজের বউ মনে করত। ওটারে বেঁচতে দিবে না কিছুতেই। হাতভইরা কুঁচামাছ আইনা সোয়াগিরে খাওয়াইত। তবুও রাখতে পারল না। একদিন গাছতলায় গিয়া দেখে সব ফক্কা। বউ পালাইছে!’

‘সে কী!’

‘হয়। এই রকমই হয়। পরশুরাম ঠিক এক সময় সুয়োগ বুইঝা দিছে বেঁইচা। টাকার কাছে এই দুনিয়াটা সব সময় বশে থাকে।’

‘তারপর?’

‘হরিনাথ পাগল হইয়া গেল খুঁজতে খুঁজতে। তারপর নিজেই একদিন উধাও। আমার মনে হয়, খুঁজতে খুঁজতে খালে নামে। কুমিরে টাইনা নিয়া যায়। বেচারি পরশুরাম!’

সুখেন দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে।

আকাশে আবার কালির ছোপ। ধারে কাছে কোথাও কাশফুলের হিল্লোল নেই, যদিও মা এসে যাবেন আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে।

মাছি

আমার সামনে টেবিলের ওপর এক টুকরা চিনি পড়েছিল। একটা মাছি খুব মন দিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। চিনির কাছে মুখ রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে আছে, মন হয় সে একটা ভারী ভাবনায় পড়ে হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটু ভালো করে দখলে বোঝা যায় সে এখন আহারে ব্যস্ত। তার মুখের তলায় শুঁড়ের মতো কী একটা বার বার ওঠানামা করছে। একবার চকিতে চিনির ওপর ঠেকে আবার মুহূর্তের মধ্যে কোথায় ঢুকে যাচ্ছে। কাজটা এত তাড়াতাড়ি চলছে যে ভালো করে না দেখলে চোখে ধরাই পড়ে না।

ভাবলাম এই বেলা মাছিটাকে ধরে ফলি। কিন্তু মাছিটা আমার চাইতেও অনেক চটপটে। হাত একটু নড়তেই ব্যস্ত হয়ে উড়ে গেল। ওই যে তার লাল মতো মাথাটি দেখতে পাও সেই সারা মাথাটি তার চোখ। একটি দুটি নয়, হাজার হাজার চোখ। অণুবীক্ষণ দিয়ে বেশ বড়ো করে দেখলে মনে হয়, মাথাটি যেন সূক্ষ্ম জাল দিয়ে মোড়া। আরও বড়ো করে দেখলে দেখা যায় সেই জালের প্রতিটি ফোকর এক একটি আস্ত চোখ। প্রতিটি চোখের ভিতর একটি পর্দা, প্রতিটি পর্দার ওপর বাইরের জিনিসের এক একটি ছোটো ছায়া পড়ে। একরম হাজার হাজার চোখ মেলে না জানি সে জগৎটাকে কীরকম দেখে।

অণুবীক্ষণ দিয়ে মাছি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সারা শরীরে সূক্ষ্ম কৌশলের অদ্ভুত কাণ্ড। ওই যে শুঁড়ের মতো তার জিভটি, সেও কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পাখার মতা ছড়ানো জিনিসটি তার জিভের আগা। শিরার মতো জিনিসগুলির প্রতিটি এক একটি নল। সেই নল দিয়ে খাবার জিনিস চুষে খায়। নলগুলি সব মিলে গোড়ার দিকে মোটা চোঙ্গার মতো হয়েছে, সেই চোঙ্গার ভেতর দিয়ে খাবার জিনিস তার মুখের মধ্যে ঢুকে যায়। আরও সূক্ষ্মভাবে ভালো অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে প্রতি নলের মধ্যে আবার আরও কত সূক্ষ্ম কারিকুরি। এক একটি নল যেন অসংখ্য আংটির মালা— আংটির ওপর আংটি বসানো, তাতে অসম্ভব রকম পাতলা চামড়ার ছাউনি। ওই নলগুলোর গায়ে দু'পাশে যে দুটি কালো দাঁড়ার মতো দেখা যায় ওই দুটি গুটালে জিভটা ছাতার মতো গুটিয়ে যায়। জিভটা যখন মুখের ভিতর থাকে তখন তাকে এমনিভাবে গুটিয়ে রাখতে হয়, আবার খাবারের সময় দাঁড়াদুটি নাড়া দিলই নলগুলি মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে ঝাড়ের মতো ঝুলে বের হয়। গোরু বা ঘোড়ার গায়ে একরকম বড়ো মাছি বসে, তাদের ডাঁশ বলে। ডাঁশেরা রক্তপায়ী, তাই তাদের জিভের সঙ্গে একজোড়া করে হুল থাকে। জিভটাও মাছির জিভের চেয়ে অনেকখানি সরু। দেখতে কতকটা বোতলের মতো। হুলের খোঁচায় জন্তুর গায়ে ফুটো করে জিভের আগাটুকু ঢুকিয়ে রক্তপান করে।

তারপর দেখো মাছির চরণখানি। এর মধ্যেও দেখবার মতো অনেক আছে। প্রথমই চোখে পড়ে শিঙের মতো অদ্ভুত জিনিস দুটি। কিন্তু সত্যিই দেখবার জিনিস চাও তো পায়ের উঁচু ঢিবলি দুটিকে দেখো। ওই দুটি নরম তেলোর ওপর ভর দিয়ে মাছি আমাদের খাবারের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। যে ময়লার ওপর দিয়ে তারা তিনজোড়া চরণ চাপিয়ে চলে সেই ময়লা আমাদের খাবারের ওপর ঝরে পড়ে। তার সঙ্গে কত যে রোগের বীজ চলে আসে, তা ভাবলেও ভয় করে। পায়ের তেলোটিকে অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাতে সাংঘাতিক রোগের জীবাণু কিলবিল করছে। সেজন্য লোকে বলে মাছি যেন খাবারের ওপর না বসে। পায়ের তেলোটি আগাগোড়া বোলতার চাকের মতো অসমান।। তার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র। সেই ফুটো দিয়ে যেকোনো জিনিস চুষে ধরতে পারে। তাই কাঁচের মতো জিনিসের ওপরেও চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় না। দরকার হলে ফুটোগুলির ভিতর থেকে একরকম আঠালো রস বের করতে পারে, তাতে পা আরও মজবুত ভাবে এঁটে বসাতে সুবিধে হয়। মাছি উড়বার সময় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ছশোবার ডানা ঝাপটায়। খুব ব্যস্ত হলে এক সেকেন্ড প্রায় বিশ-পঁচিশ হাত উড়ে যেতে পারে। মাছির শরীরের দু'পাশে ছোটো ছোটো ফুটো থাকে, সেগুলিই তার নাক।

ছারপোকা বা মশার মতো মাছি কামড়াতে পারে না। সেজন্য মানুষ মাছির ভয়ে ব্যস্ত হয় না। কিন্তু উৎপাত ও রোগ বিস্তারে কারও চেয়ে কম নয়। মাছি মারবার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়। নানা রকম ফাঁদ পেতে বিষাক্ত খাবারের লোভ দেখিয়ে মাছির বংশ উজার করতে হয়। না হলে রোগে ভুগে মানুষেরই বংশ উজার হয়ে যাবে।

শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের পথে পথে

রামেশ্বরম্

শ্রীরামের পূজিত ঈশ্বর রামেশ্বর বা রামেশ্বরম্। শৈব ও বৈষ্ণব তীর্থের অন্যতম রামেশ্বরম্। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের দ্বাদশ রামলিঙ্গেশ্বর এখানে রয়েছে। ভারতের শেষ প্রান্তভূমি পক প্রণালীতে শঙ্খরূপী দ্বীপভূমি রামেশ্বরম্। মন্দিরময় শহর। এখানকার দেবতা আরুলমিত্ত রামলিঙ্গেশ্বর বা রামনাথস্বামী। প্রাচীরে ঘেরা ৬ হেক্টর জমি জুড়ে রামনাথস্বামীর মন্দির। রাবণ বধের পর ব্রহ্মহত্যার পাপক্ষয়ের জন্য শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা থেকে ফেরার পথে পুজো করেন শিবের। ১২১২ স্তম্ভের ওপর নির্মিত মন্দির দ্বাদশ শতকে চোল রাজাদের হাতে শুরু হয়ে শেষ হয় নায়ক রাজাদের হাতে ঊনবিংশ শতকে। বিশ্বের দীর্ঘতম অলিন্দ রামেশ্বরম্ মন্দিরের। পূর্বতন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের জন্মস্থান রামেশ্বরমে। এখান থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে ধনুষ্কোডি থেকে শুরু হয়েছে রামসেতু। ১৮৯৭ সালের ২৬ জানুয়ারি পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ধনুষ্কোডীতে অবতরণ করেন।

জানো কি?

- ১৯৩০ সালে প্রথম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় কানাডায়।
- ২০১৮ সালে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে।
- ২০১৮ সালে উদ্বোধনী পতাকাবাহিকা ছিলেন পি ভি সিন্ধু।
- ২০১৮ সালে সমাপ্তি পতাকাবাহিকা ছিলেন মেরি কম।
- ২০১৮ সালে ৭১ টি দল অংশগ্রহণ করেছিল।
- ২০১৮ সালের কমনওয়েলথ গেমসের মাসকটের নাম ছিল বরোবি।

ভালো কথা

পুজোর আনন্দ

আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চমীর সকাল এগারোটায় আমাদের পাড়ার প্রায় সবাই মা কিংবা বাবাকে নিয়ে দুর্গামণ্ডপ হাজির হলাম। শ্যামলকাকু সহ ক্লাবের বড়োরাও এসে গেলেন। আগে থেকেই যাদের কুপন দেওয়া হয়েছিল তারাও এসেছে। আমরা বাহান্ন জন আগেই এক সেট পুজার পোশাক ক্লাবে পৌঁছে দিয়েছিলাম। শ্যামলকাকু একটা ছোটো মতো ভাষণ দিয়ে বললেন এরাও আমাদের ভাই। পুজোর সময় এদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমাদের গিয়ে আসা উচিত। আগামীবছর বড়োদেরও দিতে হবে। তারপর একে একে বাহান্ন জনের হাতে নতুন জামা-প্যান্ট ও মিষ্টির প্যাকেট দেওয়া হলো। ওদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রতন দাস, দশম শ্রেণী, ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) নী দি ব জ স

(২) ণ পু রা কা কা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ত্রি কা ন প ব

(২) ন য় তা ন রা

১৫ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) মনোনয়নপত্র (২) শৃঙ্খলাপরায়ণ

১৫ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

(১) সাজপোশাক (২) ত্রিকোণমিতি

উত্তরদাতার নাম

(১) সুমিত্রা নাথ, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগনা। (২) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (৩) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (৪) পূজা বিশ্বাস, গাজোল, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ২৮

অভিমন্যু একাই খোলা তরবারি হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বহু সৈন্য বধ করল।

দ্রোণের একটি শরে তার তরবারি ভেঙে যায়।

কর্ণের একটি শরে ঢালটি ভাঙে।

ক্রমশঃ

তেনজিং নোরগে এক মহাপ্রাণ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯ মে, ১৯৫৩। দুপুর সাড়ে ১১টা। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে দাঁড়ালেন তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি। মানুষের সেই প্রথম মাউন্ট এভারেস্ট জয়। রচিত হলো মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এযাবৎকাল বিশ্বের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে যত বড়ো বড়ো ঘটনা বা ইভেন্ট সংগঠিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক মাইলফলক এই এভারেস্ট জয়। তেনজিং ও হিলারির এভারেস্ট জয়ের

এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে।

আগে আরও বহুবার নানা দেশের অভিযাত্রীরা এই পর্বতশৃঙ্গ জয়ের জন্য ঝাঁপিয়েছে, কিন্তু বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে। যেমন সুইস মহান পর্বতারোহী জর্জ আরভিন, ফরাসি পর্বাতারোহী রেমন্ড লাম্বার্ট প্রমুখ। আর দুই চিরবন্দিত অভিযাত্রী এরিক শিপটন ও জর্জ ম্যালোরি তো চিরতরে হারিয়েই গেলেন হিমালয়ের হিমবাহের কোলে। তাই ইন্দো-ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল কর্নেল জর্জ হান্টের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে যখন সমস্ত দিক থেকে তৈরি হয়ে এভারেস্ট অভিযানে গেলেন। তখন কিন্তু ভারত সম্বন্ধে ব্রিটেনের মানুষ খানিকটা সন্দিহান ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অভিযাত্রী দল পেরেছিলেন। দলের দুই সদস্য শ্বেত দেশের এডমন্ড হিলারি ও ভারতের তেনজিং নোরগে শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়েছিলেন চ্যাম্পিয়নরা সব পারে।

তবে এভারেস্ট জয়ের পর তেনজিং একাধিক সাক্ষাৎকারে ও আত্মজীবনীতে লিখেছেন তার কাছে এভারেস্ট নয়, ওই কীর্তি আসলে চোমোলাংমা জয়। তাঁর অভিমত, ‘ছোটোবেলায় নেপালে পাহাড়ি গ্রামের বাড়ি থেকে উঁচু পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, একাগ্র দৃষ্টিতে। এভারেস্ট নামের কোনো পাহাড়ের কথা তখন জানতাম না। জানতাম চোমোলাংমা।’ যার মানে জগদ্ধাত্রী বা হাওয়ার দেবী। নেপালিদের কাছে বিশেষ আরাধ্য ওই শৃঙ্গ। যেখানে কোনোদিন মানুষের পা পড়বে না এমন একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল শিশুমনে। ওই চোমোলাংমা বা এভারেস্ট জয়ের জন্য যে একাধিকবার বিভিন্ন দেশ অভিযান চালিয়েছে, সে খবর তার কানে পৌঁছয়নি গণমাধ্যম ছিল না বলে। তাই ২৯ মে যখন তেনজিং ও হিলারি বিশ্বের শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে দাঁড়ালেন সে খবর দার্জিলিংয়ে (তখন তেনজিং দার্জিলিংয়ে থাকতেন) এসে পৌঁছল ২ জুন। রেডিওর খবর শুনে দার্জিলিংয়ের মানুষ জেনেছিলেন সেই অতিমানবিক কীর্তির কথা।

এভারেস্ট জয়ের পর নানা সম্মান, স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তেনজিং। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পুরো পরিবার-সহ দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ১৯৫৪ সালে তৈরি হয় হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট। প্রথম থেকেই ছিলেন ওখানকার ডিরেক্টর অব ফিল্ড ট্রেনিং পদে। ভারত সরকার দিল পদ্মভূষণ শিরোপা। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তেনজিংয়ের সম্মানে চালু করেছেন তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার আওয়ার্ড। কেমন মানুষ ছিলেন তেনজিং? তার আত্মজীবনীর সহ লেখক জেমস র‍্যামেস উলম্যান লিখেছেন— ‘দার্জিলিংয়ে তাঁর বাড়িটি ছিল প্রাণ সম্পদে ভরপুর। যেদিকে তাকাও শুধু বই আর বই। এছাড়া রয়েছে ফটো। সুভেনির আর নানা দেশের থেকে পাওয়া উপহার সামগ্রী। এসব কিছুর মধ্যমণি হলেন তেনজিং নিজে। স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ী ও নম্র। সদা হাস্যময় উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। ভারতের নানা রাজ্যছাড়া নানা দেশে ঘুরেছেন তেনজিংগ। গেছেন নানা অভিযানে।

লেখাপড়া না জানা মানুষটি এভাবেই শিখে নেন নানা ভাষা। তেনজিং লিখেছেন, ‘আমি লেখাপড়া না জানলেও অনেক ভাষায় কথা বলতে পারি। বহু বছর ধরে ইংরেজদের সঙ্গে অভিযানে যাওয়ার সুবাদে তাদের ভাষাটি ভালোভাবে রপ্ত করেছি। অনেক দেশের অভিযাত্রীর সঙ্গে অভিযান করেছি। তাদের সঙ্গে মিশে তাদের ভাষা অল্প স্বল্প শিখেছি।’ যে দার্জিলিংয়ের আকর্ষণে শৈশবের বাড়ি ছেড়েছিলেন সেই শৈলশহর ছেড়ে আর কখনো যেতে পারেননি। মৃত্যু তাঁর ওই প্রিয় দার্জিলিংয়ে। জীবনের শেষ দু’ বছর তিনি কিডনির সমস্যা ও ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন। সরকারি খরচে চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দার্জিলিং তার খুব প্রিয় ছিল। আর তিনি ছিলেন দার্জিলিংয়ের মানুষের নয়নের মণি। ১৯৮৬ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যু, যে মাসে তিনি মাউন্ট এভারেস্ট অভিযান সফলভাবে করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং এমনকী সমতল শিলিগুড়ি থেকেও লাখো মানুষ শেষ যাত্রায় শামিল হয়েছিলেন। উড়ে এসেছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু স্যার এডমন্ড হিলারি। শোকবার্তা প্রেরণ করেছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স চার্লস। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পাইলট হওয়ার সুবাদে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ ছিলেন। তেনজিংয়ের মৃত্যুতে খুবই শোকাভিভূত হয়েছিলেন তিনি। আমৃত্যু তেনজিংয়ের স্ত্রী ও সন্তানদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং যথাযথ মর্যাদা সহকারে তা পালনও করেছিলেন। ■

With Best Compliments from -

TARA MA PAPER CUTTING CO.

9/8A, Nalin Sarkar Street,
Kolkata - 700 004
Mobile : 94335 63422

Prop. Kamal Patra

নবতিপরের স্পর্শে মাথা তুললেন লৌহপুরুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের মানুষ তাঁকে লৌহপুরুষের উপাধি প্রদান করেছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি এতদিন ব্রাত্য ছিলেন। তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। অথচ তিনি উদ্যোগ না নিলে স্বশাসিত রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হতো না। সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই গুজরাটে তাঁর মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোদী সরকার। সম্প্রতি সেই মূর্তির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কিন্তু না, এই লেখা নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে নয়। ৯৩ বছরের রাম ভানজী সুতরাকে নিয়ে। গত সত্তর বছর ধরে রামভানজী মূর্তি-নির্মাণে একটির পর একটি অনুপম নমুনা পেশ করে আসছেন। আট হাজার মূর্তি এবং ভাস্কর্যের তিনি স্রষ্টা। লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে ১৮২ মিটার। আমেরিকার স্ট্যাচু অব লিবার্টির প্রায় দ্বিগুণ। নিজে তৈরি না করলেও আরও ৫৪টি মূর্তির প্রাথমিক নকশা করেছেন রামভানজী। যার মধ্যে রয়েছে পুনের এম আই টি ওয়ার্ল্ড পিস ইউনিভার্সিটির জগদ্‌বিখ্যাত গম্বুজটিও। পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ পুরস্কারে ইতিমধ্যেই তাকে সম্মানিত করা হয়েছে। ২০১৬ সালে পেয়েছেন সংস্কৃতি মন্ত্রকের টেগোর পুরস্কার।

রামভানজীর জন্ম ১৯২৫ সালে। মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলার গোণ্ডর গ্রামে। বাবা ছিলেন পেশায় সূত্রধর। ছেলেবেলা থেকেই রামভানজী আঁকতে ভালোবাসেন। কাগজ হোক বা দেওয়াল— রামভানজীর পেনসিলের টানে ছবিতে ছবিতে ভরে ওঠে। ভাস্কর্যের দিকে ঝোঁকও সেই বয়েসে। রাস্তা থেকে পাথর কুড়িয়ে এনে ছেনি হাতুড়ির আঘাতে আশ্চর্য সব মূর্তি বানিয়ে ফেলতেন। মাটির মূর্তি বানাতেও তার জুড়ি মেলা ভার। এইভাবেই বড়ো হচ্ছিলেন রামভানজী। কিন্তু দিন কখনও সমান যায় না। যে স্কুলে পড়তেন রামভানজী, হঠাৎ সেখানকার এক শিক্ষক চাকরি ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যাওয়া মনস্থ করলেন। রামভানজী তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। সেই শিক্ষক ঠিক করলেন ছাত্রটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কারণ গ্রামের ওই স্কুলটি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্তই। তারপর আর পড়ার উপায় নেই। নতুন গ্রামে গিয়ে রামভানজীকে অন্য স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হলো। থাকা খাওয়া

নিজের স্টুডিওয় রামভানজী।

এবং পড়াশোনা করতে পারার বিনিময়ে রামভানজীকে ওই শিক্ষকের বাড়ির অনেক কাজকর্ম করে দিতে হতো।

প্রতিভা চিরকাল তার আধারকে শক্তি জোগায়। স্বপ্ন দেখায়। টেনে নিয়ে যেতে চায় কোনও দূর লক্ষ্যের দিকে। বয়স যত বাড়ছিল রামভানজীও স্বপ্ন দেখছিলেন। ভাস্কর হওয়ার স্বপ্ন। চূড়ান্ত বাস্তববাদী মানুষ। সেই কুঁড়ি ফোটা বয়সেই জানতেন শিল্পের সর্বোচ্চ সোপানে পা রাখতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি রোজগারে মন দিলেন। যাতে তার শিল্পশিক্ষায় অর্থাভাব কখনও না হয়। জীবনে নানা বিচিত্র ধরনের কাজ করেছেন। কিন্তু নিজের লক্ষ্য থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। এই ভাবে চলতে চলতে একদিন ভর্তি হলেন জে. জে. স্কুল অব আর্টসে। এক সময় শেষ হলো শিল্পশিক্ষা। ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে চাকরি নিলেন। পেশাদার ভাস্কর হিসেবে কাজ শুরু করার আগে এই প্রস্তুতিটুকু দরকার ছিল। যেদিন বুঝলেন তিনি তৈরি, চাকরি ছাড়তে দ্বিধাবোধ করলেন না। শুরু হলো একের পর এক পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া।

আজ আর রামভানজী শুধু ভারতের নন। তাঁর কাজ ছড়িয়ে পড়েছে রাশিয়া, ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স ও ইটালিতে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি ছাড়া তৈরি করেছেন মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মওলানা আজাদ, মহারাজা রঞ্জিত সিংহ এবং ভগৎ সিংহের মূর্তি।

জীবনের ন'টি দশক পেরিয়ে এসেছেন রামভানজী। কিন্তু সময় তাঁর কিছুই কেড়ে নিতে পারেনি। এখনও তিনি স্বপ্ন দেখেন। নতুন কোনও কাজ করার সময় এখনও তাঁর মন সজীব হয়ে ওঠে। ছেলে অনিল রাম বাবাকে সাহায্য করেন। রামভানজীর নয়ডার স্টুডিয়োতে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে ইতিহাস। ইতিহাসের দাবি, স্বেচ্ছাচারী শাসকের মদতপুষ্ট ঐতিহাসিকদের কলমের খোঁচায় যেসব কালপুরুষ আজ অপাংক্তেয়, ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের সম্মান। তাঁদের রাজছত্র এবং সিংহাসন। রামভানজী সেই পুনর্নির্মাণের কারিগর। শিল্প দক্ষতার জন্য তিনি তো প্রশংসিত হচ্ছেনই, ভবিষ্যৎ ভারত তাঁকে ইতিহাস-সচেতন শিল্পী হিসেবেও মনে রাখবে।

কোনও হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না

রজত ভূষণ দাস

সবাই জানেন যে, সূর্যকে অবিরাম গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তবু আমরা বলি সূর্য পূর্বদিকে ওঠে আর পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। এতে স্বভাবতই একটি ধারণা হতে পারে যে, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এক সময়ে অবশ্য এ ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালের প্রবাহে মানুষের ধ্যানধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায় এটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা যা আজও আমরা বলে থাকি।

কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। একই ভাবে 'হিন্দুধর্ম' এই শব্দবন্ধটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এক সময় বিদেশিরা বিশেষ করে গ্রিক ও পারশিরা সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে বসবাসকারীদের হিন্দু বলে অবহিত করতেন--- তা থেকেই হিন্দু বা হিন্দু শব্দবন্ধের উদ্ভব। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এটি সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ— অতি পুরাতন কিন্তু নিত্যনতুন। বিজ্ঞানের মতে শক্তির সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই। আছে রূপান্তর। সেভাবেই সনাতন ধর্ম হচ্ছে শাশ্বত। এর সৃষ্টিও নেই। ধ্বংসও নেই। আছে যুগে যুগে সংস্কার।

সনাতন ধর্ম কারো প্রবর্তিত বা প্রচারিত ধর্ম নয়। এটি কারো প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি নয়। সনাতন ধর্ম প্রকৃতিজাত। এটি মানবজাতির জীবনশৈলী বা জীবনযাত্রা। তাই সনাতন ধর্মের কোনও প্রবর্তক নেই। এ ধর্ম যে সমগ্র মানব জাতির তার উদাহরণ হলো পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যে যাগযজ্ঞ হয়, তাতে সমস্ত বিশ্ববাসীর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়। বিশ্বের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ এমনকী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও মানব জাতির কথাই বিধৃত রয়েছে, বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা নয়।

প্রতিটি মৌলিক পদার্থের একক হচ্ছে পরমাণু। এক একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু এক একটি সুনির্দিষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এবার যেকোনও পাঁচটি পদার্থের একটি পরমাণু নিয়ে সেই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের পরমাণুর প্রতিটি থেকে পৃথক পৃথক ভাবে পাঁচটি করে ইলেকট্রন ও পাঁচটি করে প্রোটন নিয়ে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে— ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন পাঁচরকম মৌলের পাঁচটি ইলেকট্রন একই গুণসম্পন্ন এবং প্রোটনগুলোও সমগুণসম্পন্ন। তাহলে এক জাতীয় উপাদানে গঠিত বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন গুণসম্পন্ন হয় কেন? ভিন্নতার কারণ হলো পরমাণু গঠন প্রক্রিয়া। যেমন হাইড্রোজেন ও তামার পরমাণু একই ইলেকট্রন, প্রোটন ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে গঠিত, কিন্তু উভয় পরমাণুতে সম সংখ্যক ভাবে উপাদান সমূহ নেই। হাইড্রোজেনের প্রতিটি পরমাণুতে একটি করে ইলেকট্রন ও প্রোটন আবার তামার প্রতিটি পরমাণু গঠিত হয় ২৯টি করে ইলেকট্রন ও প্রোটন, নিয়ে। তা হলে দেখা গেল উল্লিখিত দু'টি মৌলের গুণগত পার্থক্যের জন্য দায়ী হলো উপাদান সমূহের পরিমাণগত পার্থক্য। একই ভাবে শুধু পৃথিবী কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেতন, অচেতন সবই মূলত একই উপাদান সমূহের সমাহার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। পার্থক্য শুধু পরিমাণগত। পরিমাণগত ও পরিবেশগত পার্থক্যের কারণেই গুণগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে মনে আসে বেদের আপ্তবাক্য— সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ সবকিছুই ব্রহ্মময়। সেরকমই 'একমেবা বহুস্যামি' অথবা 'যেই কৃষ্ণ সেই কালী'। এটাই সনাতন ধর্মের দিকনির্দেশনা বা অভেদ ভাবনা। এখানেই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব। মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি যখন সৃষ্টিশীল বা ক্রিয়াশীল হয় তখনই সেগুলি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সম্পন্ন হয়। সৃষ্টিশীল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বা নির্গুণ— এটাই কি অভেদ নয়? এটাই সাম্যবস্থা।

বর্তমানের রাজনৈতিক আবহে হিন্দুত্ব নিয়ে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফুলঝুরি ছুটছে। রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে নানা জনের নানা মত ব্যক্ত হচ্ছে। ইতিবাচক আলোচনা সমালোচনা অবশ্যই কাম্য। প্রতিটি চিন্তাভাবনাকে খোলামনে স্বাগত জানাতে হয়। বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে যেমন সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বিভিন্ন মত-পথকে সম্মান না করলে সমাজ কূপমণ্ডূক হয়ে যায়। গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম।

হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম বিজ্ঞানের অমোঘ সত্যকে ধারণ ও লালন করেই প্রবহমান। তাই সনাতন ধর্ম প্রকৃতি সঞ্জাত ধর্ম। বিজ্ঞানময়ী ধর্ম। সংস্কারবাদী ধর্ম। এই ধর্মে গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার বা অলৌকিকতার স্থান নেই। স্বামীজীর কথায়— 'কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ।' তিনি আরও বলেছেন, 'জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের সাধন প্রচেষ্টা নিরূপিত হয়। .... বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতি-ব্যবস্থা। হিন্দুগণ এই রহস্য ধরিতে পারিয়াছেন।' শীতপ্রধান, চরমভাবাপন্ন ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু ভিন্ন প্রকৃতির। জল অবস্থানগত কারণে কখনও তরল, বাষ্প ও কঠিন রূপ ধারণ করে। তাই জলবায়ু ও পরিবেশ পরিস্থিতিগত কারণে কোনও স্থানের মানুষের মধ্যে একদেশদর্শিতা, কোথাও উগ্রতা, কোথাও সমদর্শিতার প্রাধান্য দেখা দিতে পারে। এটা কি অস্বাভাবিক? সঙ্গত ভাবেই তাদের দৈহিক গঠন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা-সংস্কৃতি- কৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে কি কোনও ঐক্যের খোঁজ পাওয়া যায় না? যদি পাওয়া যায় তাহলে কেন এমনটা হলো? উত্তর একটাই— সত্য শাশ্বত, কিন্তু সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা,ধর্মান্ধতা আসে সাধারণত জ্ঞানের অভাব থেকে। জ্ঞানের অভাব থেকেই মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে মানুষের পশুত্ব জাগ্রত হয়। মূলত জ্ঞানের পথ রুদ্ধ হয় আমিত্ব বা অহং বোধ থেকে। সনাতন ধর্মের অভেদ ভাবনার বিকাশ যতই বৃদ্ধি পাবে, মানুষের আমিত্ব বা অহং ততই লুপ্ত হতে থাকবে। ততই মানব মনের পশুত্ব ভাব বিলুপ্ত হয়ে মানবিক ভাব বিকশিত হবে। মানব উন্নীত হবে দেবত্বে। সেই সেই মানবরাই অমৃতের পুত্র।

অভেদ ভাবনার প্রসঙ্গে মনে হতেই পারে, সনাতন ধর্মে এত বর্ণ বৈষম্য কেন? স্বাভাবিক প্রশ্ন, তবে এটি আপাত বৈষম্য। এর উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সুন্দরভাবে দেওয়া আছে --

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।। ৪/১৩

সৃষ্টিকর্তা নিজে অকর্তা ও বিকার রহিত ভাবে মনুষ্য জাতিকে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চারটি শ্রেণীতে বিভাজিত করেছেন। এটি বিজ্ঞান সম্মত। জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞানের জন্য আমরা অন্ধ হয়ে স্রষ্টা নির্দেশিত পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। এই বিচ্যুতি থেকেই সমাজদেহে আসে অসঙ্গতি, অশান্তি, ভোগবাদ। ব্যক্তির মধ্যে আসে কামনা-বাসনা, অহংবোধ। সৃষ্টি হয় অনাচার। জ্ঞানের প্রভাবে মানুষের অন্তর্মুখী ভাবনা বৃদ্ধি পায়, আত্মশক্তি জাগরিত হয়। তখন মানুষ সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। সনাতনধর্ম সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করতে শেখায়। হিন্দুত্বের মধ্যে রয়েছে বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি।

সনাতন ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো উপাসনা পদ্ধতির বিবিধতা। গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। ৪/১১

অর্থাৎ যে যেভাবেই উপাসনা করে থাকুক না কেন, শেষে ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হবে। এর চেয়ে উদার আহ্বান আর আছে কি? সনাতন ধর্মেরই নাম মানব ধর্ম। এই ধর্মের কথা বলেই স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয় করে এসেছিলেন। তাই এই ধর্মের অনুসারীরা কখনই সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। ■

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN

করুন

উন্নতি করুন

DRS INVESTMENT

Contact :

9830372090

9748978406

Email : drsinvestment@gmail.com

uti UTI Mutual Fund · HDFC MUTUAL FUND · SBI MUTUAL FUND A partner for life.

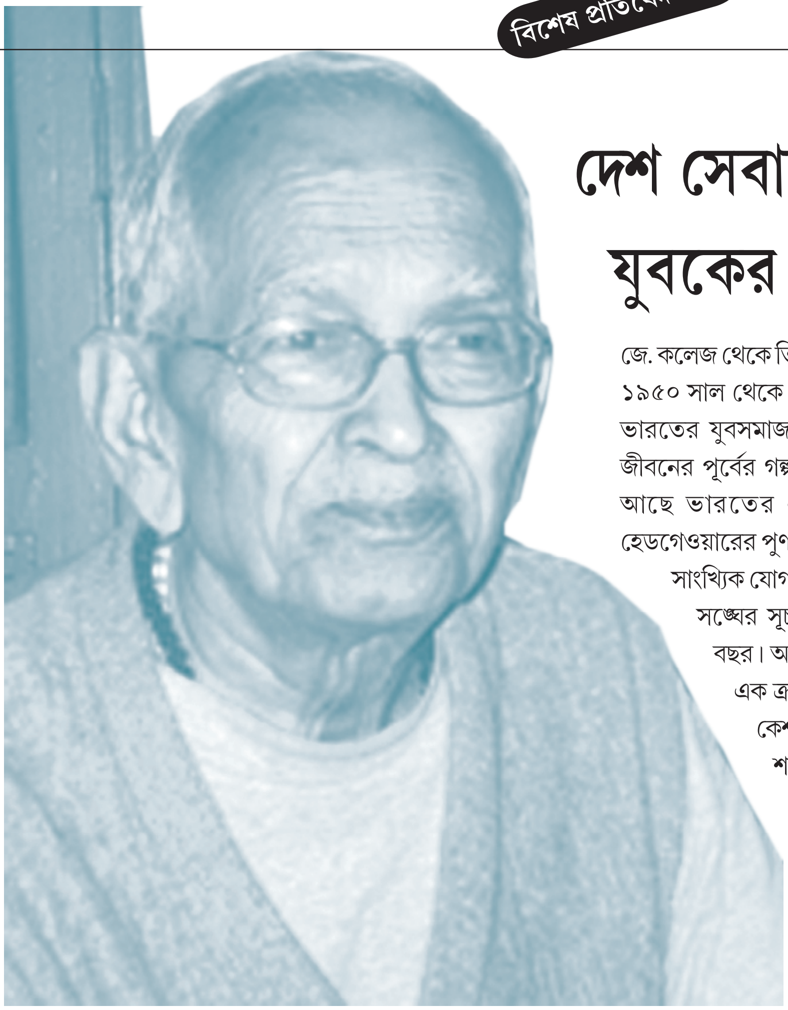

দেশ সেবার সূত্রে এক মারাঠি যুবকের বাঙ্গালি হয়ে ওঠা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

১৯৫০ সাল থেকে একাদিক্রমে প্রায় ৬৮ বছর কাটিয়েছেন এক মারাঠি যুবক বঙ্গের নগরে প্রান্তরে; জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, ভারতীয় সংস্কৃতির অখণ্ড চর্চায় বাঙ্গালি সমাজকে অবগাহনের মন্ত্র শোনাতে গিয়ে নিজে কখন যে অনবধানে ডুব দিয়েছেন বঙ্গ-সংস্কৃতির অতল গভীরে আর হয়ে উঠেছেন আদ্যন্ত এক বাঙ্গালি— তা নিজেও হয়তো টের পাননি। হ্যাঁ, এমনই এক প্রবীণ ব্যক্তিত্ব আজও আমাদের সঙ্গে একই সংস্কৃতিচর্চার শরিক হয়ে, পশ্চিমবঙ্গের পুণ্যভূমে দেশভক্তির জপমালার পুঁথি বিতরণ করে চলেছেন কলকাতা মহানগরীতে বসে। তিনি সর্বজনমান্য নবতিপর স্বয়ংসেবক কেশবরাও দীক্ষিত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতের জন্ম ১৯২৫ সালের আগস্টে, মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার ফুলগাঁওয়ে। পিতা দত্তাত্রেয় দীক্ষিত, মাতা সগুণা দেবী এবং পিতামহ চিন্তামণি দীক্ষিত। পারিবারিক পেশা পৌরোহিত্য হলেও, তাঁর পিতা ছিলেন পরিবারের প্রথম চাকুরীজীবী। দত্তাত্রেয় প্রথমে একটি কটন মিলে কাজ শুরু করলেও পরে নিজের উদ্যোগে বস্ত্র সংক্রান্ত স্বাধীন ব্যবসা শুরু করলেন, আর তাতেই পারিবারিক সমৃদ্ধির সূচনা ঘটল। পাঁচ ভাই ও চার বোনের সংসারে কেশবজী ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর উপনয়ন হলো। ১৯৪৯ সালে জলগাঁওয়ের এম. জে. কলেজ থেকে তিনি মারাঠি ও সংস্কৃতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করলেন। ১৯৫০ সাল থেকে শুরু হলো প্রচারকের জীবন; আজও সেই পথে ভারতের যুবসমাজকে পথ দেখাচ্ছেন। এই ৬৮ সালের প্রচারক জীবনের পূর্বের গল্পও শুনিয়েছেন তিনি। সে কাহিনি সম্পৃক্ত হয়ে আছে ভারতের এক মহান সন্তান ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের পুণ্য পরশ। একটি কর্মময় সংস্থার ইতিহাসের সঙ্গেও সাংখ্যিক যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে, কারণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সূচনা আর কেশবজীর জন্মসাল ঘটনাচক্রে একই বছর। আর এই দুই 'কেশব' সান্নিধ্য যেন দীপ জ্বালানোর এক ক্রমান্বয় বার্তা। কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার শিশু কেশবের প্রাণে যে অগ্নি প্রজ্বলন করেছিলেন তা নানান শাখায় বঙ্গভূমিতে শতদীপে বিকশিত হয়েছে।

বাল্যকালেই কেশবজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সান্নিধ্যে আসেন। তখন তার বয়স মাত্র পাঁচ। ডাক্তারজী ফুলগাঁও জংশন স্টেশন হয়ে ওয়ার্ধা জেলারই আর্ভি শহরে যেতেন, সেখানে সঙ্ঘের একটি ভালো শাখা ছিল। বহু দেশব্রতী মারাঠি যুবক আসতেন সেখানে। এমনই একটি শাখায় ডাক্তারজীও মাঝে মাঝে আসতেন, নামতেন ফুলগাঁও জংশনে এবং সেই সুযোগে কেশবজীর পিতা ডাক্তারজীকে তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে ভুলতেন না। কারণ কেশবজীর বাবাও একজন স্বয়ংসেবক ছিলেন। দত্তাত্রেয়র আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে ডাক্তারজী তাঁদের বাড়িতে একাধিকবার এসেছেন, চা-জলখাবার খেয়েছেন। এমনই আসা-যাওয়ার সূত্রে বালক কেশব প্রথমবার ডাক্তারজীকে নিজের বাড়িতে দেখলেন ১৯৩০ সালে। দরজার কোণে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এক মহাপুরুষকে, তাঁর কথা গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন এক অমোঘ আকর্ষণে। ১৯৩৮ সালে কোনও একদিন ফুলগাঁও থেকে ৩-৪ কিলোমিটার দূরে নাসেরগাঁও সঙ্ঘ-শাখায় কেশবজীর জন্য অপেক্ষা করছিল এক সুবর্ণ দিন। সেদিন ডাক্তারজী শাখায় এলেন। শাখায় উপস্থিতির সংখ্যাও সেদিন যথেষ্ট। সঙ্ঘের প্রার্থনা তন্ময় হয়ে গাইলেন বালক কেশব। মারাঠি ও হিন্দিতে স্লোগানও দিলেন। শাখায় উপস্থিত ছিলেন কেশবের পিতা দত্তাত্রেয়। ডাক্তারজী বালকের কণ্ঠে সঙ্ঘপ্রার্থনা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দত্তাত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন কে এই বালক। দত্তাত্রেয়র সন্তান জেনে আরও খুশি হলেন। খুব আদর করলেন বালক কেশবকে। ওই সোনালি দিনগুলি স্মরণ করে আজও সপ্রতিভ হয়ে ওঠেন কেশবজী, ফিরে যান সেই বালক-বেলায়। ■

বিদেশে শুটিংয়ের জন্য পদত্যাগ করলেন অনুপম খের

পুনের চলচ্চিত্র টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান এফটিআইআই-এর চেয়ারপার্সন পদে ইস্তফা দিলেন অনুপম খের। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রককে লেখা এক পত্রে শ্রীখের জানিয়েছেন, বিদেশে একটি সিনেমার শুটিংয়ের জন্য তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, ২০১৮-১৯ সালে প্রায় ন'মাস তিনি দেশের বাইরে থাকবেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে এফটিআইআই-এর চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক অনুপম খেরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছে। মন্ত্রকের মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন রাঠোর এফটিআইআই-এর কাজ সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য অনুপম খেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শ্রী রাঠোর অনুপম খেরকে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় সংস্কৃতির দূত হয়ে তিনি কাজ করবেন বলে শ্রীরাঠোর আশা প্রকাশ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার নিরিখে মন্ত্রক বিভিন্ন সময়ে অনুপম খেরের পরামর্শ নেবে বলেও তিনি জানান।

মিজোরামে ভারত-জাপান সেনা মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারত ও জাপানের সেনাবাহিনীর যৌথ সেনা মহড়া 'ধর্ম গার্জেন' ২০১৮ মিজোরামের ভাইরেঙ্গটে গত ১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। ভাইরেঙ্গটের কাউন্টার ইনসারজেন্সি ও জঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুলে এই মহড়া চলছে। জাপান এথকে ৩২ নম্বর ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ান ও ভারতের পক্ষ থেকে ৬/১ গোর্খা রাইফেলস্ রেজিমেন্টের একটি প্ল্যাটুন সৈনিক এই দু-দেশীয় যৌথ মহাড়ায় অংশ নিচ্ছে। ১৪ দিনের এই সেনা মহড়া এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দু-দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং দক্ষতা তৈরি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্যই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। যৌথ মহড়ায় শিক্ষা কক্ষের ভেতর এবং বাইরেও প্রশিক্ষণের কর্মসূচি থাকবে, যাতে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এছাড়া, এই মহড়ায় যে কোনও যৌথ অভিযানে সাফল্য অর্জনের জন্য দু-দেশের বাহিনীর মধ্যে মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা অর্জনের ওপরও জোর দেওয়া হবে। শহরাঞ্চলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেসব বিপদ দেখা দিতে পারে, সেগুলি মোকাবিলার জন্য দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনেও দু-দেশের সেনাবাহিনী যৌথভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। এর ফলে, জাপান ও ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মানবোধ বৃদ্ধি পাবে।

তৃণমূলের হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রচার করার কথা স্বপ্নেও ভাবি না ঃ প্রহ্লাদ মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিজেপি সরকারকে চাপে ফেলতে প্রধামন্ত্রীর ভাইকে প্রচারে নামাতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস— এরকম একটি খবরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। সত্যিই কি নরেন্দ্র মোদী বিরোধিতায় তৃণমূলের হাত ধরতে চলেছেন প্রহ্লাদ মোদী? এবিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাইকে সরাসরি ফোন করে জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল। প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতায় তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নামবেন? প্রহ্লাদ মোদীর জবাব, কোথা থেকে এই খবর পেলেন? প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রচার করব, এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশন নামে রেশন ডিলারদের একটি সর্বভারতীয় সংস্থার সহ সভাপতি প্রহ্লাদ মোদী। রেশন ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরোধিতা শুরু করেছে সংগঠনটি। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, ২০১৯ সালের ভোটে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যাটন ধরবেন তাঁর ভাই প্রহ্লাদ মোদী।

গুজরাটের বাসিন্দা প্রহ্লাদ মোদী ফোনে জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালকে জানান, 'আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রচার করব। তৃণমূলের কাউকে আমি চিনিই না।' তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারর বিরুদ্ধে আপনারা এতটা সোচ্চার কেন? প্রহ্লাদ মোদী বলেন, 'সে আমি রেশন ব্যবস্থা নিয়ে ধরনা বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে প্রচারে নামব না।' সংবাদমাধ্যমে যে খবর বেরিয়েছে তা নিয়ে কী বলবেন? প্রহ্লাদ মোদীর জবাব, 'আমি জানি না কোথা থেকে এসব খবর বেরিয়েছে।' উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে রাফাল প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদী একজন সৎ মানুষ। সরকার কী করতে চায় সেটা তারাই জানে। আমি একজন গম বিক্রেতা। হিন্দু হিসেবে আমি শুধু রামমন্দির নির্মাণ চাই।'

‘ঐক্যের প্রতিমূর্তি’ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গুজরাটের নর্মদা জেলার কেভাডিয়ায় গত ৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে ১৮২ মিটার উচ্চতার ‘ঐক্যের প্রতিমূর্তি’ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও সমবেত অতিথিরা স্মারক হিসেবে নর্মদা নদীর জল ও মাটি দিয়ে একটি কলস পূর্ণ করেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী লিভারের সাহায্যে মূর্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সেদিন সেখানে তিনি একতা দেওয়ালেরও উদ্বোধন করেন এবং মূর্তির পাদদেশে বিশেষ প্রার্থনায় অংশ নেন। পরে তিনি সংগ্রহশালা, প্রদর্শনী, দর্শকদের জন্য নির্ধারিত গ্যালারি ঘুরে দেখেন। এই গ্যালারি ১৫৩ মিটার উচ্চতায় তৈরি হয়েছে। এই গ্যালারি থেকে সর্দার সরোবর বাঁধ, জলাধার এবং সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্বতমালার অপূর্ব দৃশ্য পর্যটকরা উপভোগ করতে পারবেন।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর তরফে বিশেষ বিমান অনুষ্ঠানে ফ্লাইপাস্টের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানায়। সেখানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আজ সমগ্র দেশ একতা দিবস পালন করছে। আজকের দিনটি ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ মুহূর্ত। এই ‘ঐক্যের প্রতিমূর্তি’ তৈরির মাধ্যমে ভারত প্রগতিশীল ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে উদ্বুদ্ধ করছে। এই মূর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্দার প্যাটেলের আদর্শ, ক্ষমতা ও সাহসিকতা সম্পর্কে স্মরণ করাবে। সর্দার প্যাটেল যে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলেছিলেন, তার ফলশ্রুতিতেই দেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিকে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক কাজে সর্দার প্যাটেলের চিন্তাভাবনার কথাও স্মরণ করে বলেন, এই ‘ঐক্যের প্রতিমূর্তি’ তৈরি করার জন্য যে কৃষকরা তাঁদের জমি দিয়েছেন এবং লোহা দিয়েছেন--- এই মূর্তি তাঁদের আত্মসম্মানের প্রতীক। ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’— এই মন্ত্রের মাধ্যমেই ভারতের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা সম্ভব।’ এই মূর্তি নির্মাণের কাজে জড়িত প্রত্যেককে প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মহান নেতাদের কাজের স্মরণে বেশ কয়েকটি স্মারক নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাঁদের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সুভাষ চন্দ্র বসুর স্মরণে দিল্লিতে একটি সংগ্রহশালা তৈরির কাজ চলছে। মুম্বইয়ে চলছে শিবাজীর মূর্তি তৈরির কাজ। সারা দেশেই নির্মাণ করা হচ্ছে উপজাতি বিষয়ক সংগ্রহশালা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সর্দার প্যাটেলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এই লক্ষ্যে সকলের জন্য আবাস, সকলের জন্য বিদ্যুতায়ন, সড়ক যোগাযোগ, জন-আরোগ্য যোজনা এবং ডিজিটাল যোগাযোগের মতো সুবিধাগুলি রূপায়ণ করা হয়েছে। তিনি আবেদন করেন, দেশ বিভক্ত করার সবরকম চেষ্টা বিফল করে দেশের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

অক্টোবর মাসে জিএসটি খাতে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর(জিএসটি) খাতে সদ্য সমাপ্ত অক্টোবর মাসে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এই রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যে সিজিএসটি খাতে আদায় হয়েছে ১৬ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা, এসজিএসটি খাতে আদায়ের পরিমাণ ২২ হাজার ৮২৬ কোটি টাকা, আইজিএসটি খাতে আদায়ের পরিমাণ ৫৩ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা (আমদানি বাবদ সংগৃহীত ২৬ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা সহ) এবং সেস থেকে আদায়ের পরিমাণ ৮ হাজার কোটি টাকা (আমদানি বাবদ সংগৃহীত ৯৫৫ কোটি টাকা সহ)। রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জিএসটিআর থ্রিবি রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা ছিল ৬৭ লক্ষ ৪৫ হাজার। কেন্দ্রীয় সরকার সিজিএসটি খাতে ১৭ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা এবং এসজিএসটি খাতে ১৫ হাজার ১০৭ কোটি টাকার নিষ্পত্তি করেছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আইজিএসটি বাবদ থাকা অর্থের মধ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার নিষ্পত্তি করেছে। অক্টোবর মাসে জিএসটি সংক্রান্ত বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয়ের স্থায়ী সমাধানের পর কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা ও ৫২ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকা। জিএসটি বাবদ রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ গত সেপ্টেম্বর মাসে সংগৃহীত ৯৪ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা থেকে ৬.৬৪ শতাংশ বেড়ে অক্টোবর মাসে ১ লক্ষ ৭১০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। কেরালা, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড ও মহারাষ্ট্র থেকে অক্টোবর মাসে উল্লেখযোগ্য হারে জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদেশি অর্থে পুষ্টে এনজিওগুলির দেশদ্রোহিতা, পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিদেশি অর্থে পুষ্ট এনজিওগুলির ব্যাপারে সতর্ক হচ্ছে কেন্দ্র। এই বিদেশি অর্থ দেশদ্রোহিতামূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে গোয়েন্দাদের আশঙ্কা। সম্প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের কাছে আবেদন জানিয়েছে যে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এন জি ও)-র কাজকর্মে নজরদারি চালাতে, বিশেষ করে 'দেশ-বিরোধী কর্মে' যেখানে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে যুগ্ম-সচিব ড্যানিয়েল ই রিচার্ডস তাঁর পাঠানো বিবৃতিতে বলেছেন : 'আমাদের নজরে এসেছে যে কিছু এন জি ও এবং এধরনের সংগঠন দেশবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছে আমাদের অনুরোধ রাজ্যপুলিশও এই এন জি ও এবং অন্যান্য সংগঠনের কাজকর্ম ও তহবিলের বিষয়ে আলাদাভাবে নজরদারি করুক।'

প্রসঙ্গত, একটি প্রশ্নের উত্তরে এ বছর রাজ্যসভায় কেন্দ্র সরকার জানায়, ফরেন কনট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট (এফ সি আর এ) অমান্য করবার জন্য ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত ১৮ হাজার ৮৬৪টি এন জি ও-র এফ সি আর এ লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এন জি ও-গুলির কাছে বিদেশি অর্থ এসেছে ভারতীয় মুদ্রায় ১৫ হাজার ২৯৯ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ বর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৭ হাজার ৭৭৩ কোটি টাকা। এরপর সরকার কড়াকড়ি শুরু করায় একলহমায় এন জি ও-গুলিতে বিদেশি অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকা।

গোয়েন্দাদের অভিমত, দেশের দরিদ্র-নারায়ণ সেবার নামে এই বিদেশি অর্থ এলেও তা মোটেও এই কাজে ব্যবহৃত হয় না। বরং সুকৌশলে বিদেশি শক্তি বিভিন্ন এন জি ও-র মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ লগ্নি করে ভারতকে অভ্যন্তরীণ ভাবে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য। গোয়েন্দা ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪-য় বহু এন জি ও-কে চিহ্নিত করা হয়েছিল যাদের 'বিদেশি তহবিল' ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের নয়া-সরকার অন্তত ১৩ হাজার এন জি ও-র এফ সি আর এ লাইসেন্স বাতিল করে, যাদের মধ্যে গ্রিনপিস, কমপ্যাশন ইন্টারন্যাশনাল, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মতো নামিরাও ছিল। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ তাদের রিপোর্টে ইসলামিক ধর্মগুরু জাকির নায়েক ও অন্যতম মাওবাদী মুখ তিস্তা শীতলাবাদের এন জি ও-কে 'দেশদ্রোহী কাজ'-এ যুক্ত থাকার অভিযোগ চিহ্নিত করে।

এই বছরের মে মাসে ভীমা-কোরেগাঁও হামলায় যুক্ত থাকবার অভিযোগে এবং প্রধানমন্ত্রীকে খুনের চক্রান্তের যোগসাজশের জন্য পুনে পুলিশ ভারভারা রাও, সুধা ভরদ্বাজ, অরুণ ফেরিরা, গৌতম নওলখা, ভারনন গঞ্জালভেসকে গ্রেপ্তার করে। তাদের এন জি ও-গুলি থেকে দেশ-বিরোধী চক্রান্তের আভাস পায়। শহুরে নকশালদের সমর্থনে যে প্রতিবাদগুলি সংগঠিত হচ্ছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে একটি দৈনিকের মাধ্যমে— তাদের নানাবিধ ব্যবসায় অবৈধ বিদেশি লগ্নির অভিযোগ বহুদিনের এবং তারা দেশ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের সমর্থকও। কিছুদিন আগে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট) অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বেঙ্গালুরু অফিসে তল্লাশি চালায় অবৈধ বিদেশি তহবিলের অভিযোগে।

রামমন্দিরের সঙ্গে কোটি কোটি হিন্দুর আবেগ জড়িত : ভাইয়াজী যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের অধিবেশন বসেছিল মুম্বইয়ের কাছে কেশবসৃষ্টিতে। অধিবেশনের শেষ দিনে সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের সঙ্গে কোটি কোটি হিন্দুর আবেগ জড়িত। এ ব্যাপারে রায় দেবার আগে সুপ্রিম কোর্টের সেটা মাথায় রাখা উচিত। তিনি আরও বলেন, গত ৬৮ বছর ধরে রামমন্দির নিয়ে মামলা চলছে। ২০১০ সালে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল। ২০১১ সালে মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। তারপর ক্রমাগত টালবাহানা চলছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, রামমন্দির নিয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে কি না বা অধ্যাদেশ জারি করা হবে কি না সেটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার। আমরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। তবে আমরা সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটি সর্বসম্মত সমাধান খোঁজার চেষ্টা অবশ্যই করব। সাম্প্রতিক শবরীমালা বিতর্ক প্রসঙ্গে ভাইয়াজী বলেন, হিন্দু সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। আমরা, হিন্দুরা বিশ্বাস করি, স্বামী এবং স্ত্রীর যৌথ উপস্থিতি ভিন্ন কোনও পুজো সম্পন্ন হতে পারে না। আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু অধিকারের ওপর ভিত্তি করে একটি সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। মানুষের বিশ্বাস এবং পরম্পরাও সামাজিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

কমেডিয়ান হয়েও চোখে জল এনে দিতে পারতেন

দিলীপ পাল

'দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা'— এই গানটির কথা মনে পড়লেই দর্শক মনে ভেসে ওঠে দুই ভাইয়ের হাসি মুখের ছবি। এদের একজন মহানায়ক উত্তমকুমার আর দ্বিতীয়জন তাঁরই অনুজ তরুণকুমার। বিশাল মহিমের ছায়ায় থেকেও নিজের অভিনয়ের দৌলতেই তিনি দর্শকদের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন।

তরুণকুমারের ছবির সংখ্যা প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি। তাঁর প্রথম ছবি 'হ্রদ', এ ছবির পরিচালক ছিলেন অর্ধেন্দু সেন। এর মধ্যে বেশ কিছু ছবিতে তিনি মহানায়ক উত্তমকুমারের সহশিল্পীর ভূমিকায় ছিলেন। মহানায়কের মৃত্যুর পরও বিভিন্ন ছবিতে আমরা তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। প্রথমেই মনে আসে 'দেয়া নেয়া', ছবিটির কথা, সেখানে সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাওয়া বন্ধু উত্তমকুমারকে আশ্রয় দেন তরুণকুমার। শুধু তাই নয়, অপর এক কবি বন্ধুর চিকিৎসার জন্য সেই কবির লেখা বই বিক্রি করে লাভবান হওয়া বই বিক্রেতার সঙ্গে তরুণকুমারের কথোপকথন সত্যিই অনবদ্য। এরপর বলতে পারি 'শুধু একটি বছর' ছবিটির কথা। এই ছবিতে তরুণকুমারের পরিচয় মহানায়কের বন্ধু ও আই বি অফিসার। সেখানে একটি দৃশ্যে বন্ধুর শ্রীমতী ভয়ংকরী স্ত্রী (সুপ্রিয়া দেবী)-কে গাড়ি নিয়ে তাড়া করার দৃশ্যটি আজও দর্শক মনে হাসির উদ্রেক করে। এই ছবিটিতে তার স্ত্রীর ভূমিকায় ছিলেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। একটি দৃশ্যে রয়েছে যেখানে মহানায়ক তাঁর রিসেপশনের অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ার কথা খবরের কাগজে দিয়েছেন, অথচ সুব্রতার খুব আশা ছিল নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভালোমন্দ খাবেন, সেই দৃশ্যে স্ত্রীর মুখের মধ্যে খবরের কাগজটি চেপে ধরে 'নেমতন্ন খাবে, খাও' এই বলার ধরনটি প্রশংসার দাবি রাখে। 'জীবন মৃত্যু' ছবিটির কথাও না বলে পারা যায় না। সেখানেও কলেজ পড়ুয়া মহানায়কের বন্ধু তিনি, পরীক্ষায় বার বার ফেল করে শেষে নামাবলী গায়ে পরীক্ষা দেওয়া ও পরীক্ষার শেষে বন্ধুদের দেখানো নামাবলীর ভিতরে আসলে রয়েছে 'উত্তরাবলী'। দৃশ্যটি মনে হয় বাঙালি কখনই ভুলতে পারবে না। এই ছবিতেই কলেজের ফাংশনে উঠে সংলাপ ভুলে যাওয়া ও দর্শকদের কাছে জল চাওয়া নিঃসন্দেহে তরুণকুমারের কৌতুকপ্রিয়তা পরিচয় বহন করে। 'পথের দাবি' ছবিটিতে 'শশীকবি'-র ভূমিকায় তাঁর অভিনয়

ছবিটিতে অন্য এক মাত্রা দান করেছিল। পথের মধ্যে সব্যসাচীর দলের লোককে বাঁচাতে মাতালের ভূমিকায় রাস্তা আটকানো কিংবা ছবির শেষের দিকে সব্যসাচী রূপী মহানায়ককে 'ডাক্তার, আমি কি বিপ্লবের কোনও কাজেই লাগতে পারি না?' বলার দৃশ্যে তরুণকুমারের অভিনয় ছিল অতুলনীয়। আরেকটি ছবিতে মহানায়কের বন্ধুর চরিত্রে তরুণকুমারের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল, সেই ছবিটি হলো 'সপ্তপদী'। 'ওথেলো'র চরিত্রের অভিনেতা না অসায় কলেজ ফাংশনের প্রধান দায়িত্বে থাকা লোক হিসাবে তরুণকুমারের ইতস্তত পায়চারি তাঁর চিন্তাগ্রস্ত মনটিকেই ফুটিয়ে তুলেছিল। শেষে কৃষ্ণেন্দুরূপী মহানায়ককে জোর করে এনে ওথেলো সাজানোর দৃশ্য তরুণকুমারের অভিনয় দর্শকদের মনে হাসির লহরী তুলেছিল। আরও বহু ছবিতেই মহানায়কের সহশিল্পী ছিলেন তরুণকুমার। সেই ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো— অগ্নীশ্বর, সন্ন্যাসী রাজা, কাল তুমি আলেয়া, বাঘবন্দি খেলা, মন নিয়ে, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, জীবন তৃষ্ণা, সাবরমতী, জীবন তৃষ্ণা, ঝিন্দের বন্দি, রাজকুমারী, মায়ামৃগ, রাজকুমারী ইত্যাদি। 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিটিতে মহানায়ক যখন তাঁকে তাঁর প্রেমিকার সন্তান সম্ভাবনার কথা জানালেন, সেই দৃশ্যে এবং এরপর অজ্ঞান হয়ে পড়ার দৃশ্যে তরুণকুমারের অভিনয় দর্শকমনে শিহরণ জাগায়। 'মায়ামৃগ' ছবিতে অভিনয়-পাগল এক যুবক রামহরির ভূমিকায় তরুণকুমার দর্শককে হাসির জোয়ারে ভাসিয়েছেন। ছবিটিতে অভিনেতার পার্ট জোগাড় করে দেওয়ার জন্য মহানায়ককে পাঁচ টাকা মুচলেকা দিয়ে বলা 'দেখো যেন কাটা সৈনিকের পাট-টাট দিও না'। সত্যিই খুব মজাদার মানুষ ছিলেন তরুণকুমার।

এবার আমরা মহানায়ক হীন কিছু ছবিতে তরুণকুমারের অভিনয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে বলি রহস্যধর্মী ছবি 'চুপি চুপি আসে'-র কথা। এই ছবিটিতে তরুণকুমারের ভূমিকা ছিল এক খুনির। ছোটোবেলায় অনাথ আশ্রমে থাকার সময় তার উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে সেই সময় অনাথ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষদের হত্যা করাই ছিল চরিত্রটির উদ্দেশ্য। ছবিতে সকলের সামনে তাঁর পরিচয় ছিল সেই খুনিকে ধরতে আসা গোয়েন্দা। বাজি ধরে বলা যায় ছবিটি প্রথমবার দেখার সময় খুনি হিসাবে তাঁর ধরা পড়ার আগে দর্শক বুঝতেই পারবেন না, তাঁর প্রকৃত রূপটি। এমনই অনবদ্য অভিনয় তরুণকুমার এ ছবিতে করেছিলেন। 'পিতাপুত্র' ছবিতেও নায়ক স্বরূপ দত্তর বন্ধুর চরিত্রে তরুণকুমার যথাযথ অভিনয় করেছিলেন।

'মিস্ প্রিয়ংবদা' ছবিতে প্রেমিকা লিলি চক্রবর্তীর শুশ্রূষার জন্য বন্ধুপ্রতিম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেয়ে সাজিয়ে প্রেমিকার বাড়িতে তার মামার কাছে পাঠানো এবং ছবির শেষ লগ্নে মামি শাশুড়ি হিসেবে সেই বন্ধুকেই প্রণামের সময় পায়ে চিমটি কাটা দর্শককে অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল। 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে সুচিত্রা সেনের দাদার ভূমিকায় তরুণকুমারের অভিনয় ছিল চোখে পড়ার মতো। এইরকম বহু ছবিতেই তরুণকুমারের অভিনয় বাঙালি দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। ■

সাপ্তাহিক রাশিফল

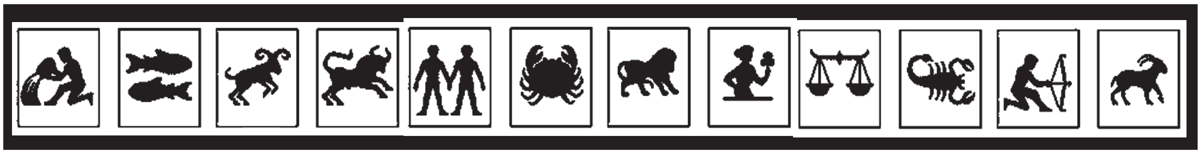

১২ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ১৮ নভেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় রবি-বক্রী শুক্র। বৃশ্চিকে বুধ-বৃহস্পতি,ধনুতে শনি, কুম্ভে মঙ্গল। শুক্রবার সকাল ৬-১০ মিনিটে রবির বৃশ্চিকে প্রবেশ এবং রবিবার বুধ বক্রী হচ্ছে। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃশ্চিকে পূর্বাষাঢ়া থেকে কুম্ভে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে।

মেষ : উদারতা, মূল্যবোধ ও জ্ঞানের প্রসার। কর্মে দক্ষতা ও ঋণমুক্তি। প্রেমের সুপ্ত বহ্নিতে শীতল বারিবর্ষণ। বস্ত্র, ওষুধ ও পরিবহণ ব্যবসায় সফল উদ্যোগ। বিদ্যার্থী, গবেষক, পরিসংখ্যানবিদ ও প্রযুক্তিবিদের উদ্বোধনী শক্তির বিকাশ ও মান্যতা প্রাপ্তি। স্বীয় ব্যক্তিত্বে অভিসন্ধির সম্যক উপলব্ধি—শত্রুজয়ী।

বৃষ : শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসনা। স্বজন সম্পর্কের উন্নতি। বিলাস ব্যসনে ব্যয় ও নিকট ভ্রমণ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় যোগ। অর্থাগমের দিকগুলি সুগম ও সাবলীল হবে। বেকারদের কর্মসংস্থানের যোগ। স্ত্রীর নামে ব্যবসার চিন্তা শুভ।

মিথুন : আলস্য-অবসাদে সুন্দর ও বর্ণময় জীবন হতাশার মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত। আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগ না করা বুদ্ধিমানের কাজ। ভ্রাতা-ভগিনীর সঙ্গে ব্যবহারে উদারতার পরিচয় দিন। সপ্তাহের শেষভাগে জ্ঞান-বুদ্ধির মিশ্রণে স্বচ্ছন্দবোধ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। প্রমোটার ও ফাটকা ব্যবসায়ে প্রাপ্তি। তবে বাতজ বেদনায় ক্লেশভোগ।

কর্কট : জীবনসঙ্গী ও নিজ শরীরের যত্ন। বাকসংযমী, মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। নন্দনের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবায়ন। বহুব্যস্ততা ও পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ ঘটলেও আইনি জটিলতা পরিহার করুন। অপোজিট পার্টনারের প্রতি সহানুভূতিশীল মন ও দয়ার্দ্র হৃদয়ের প্রকাশ। কীটপতঙ্গ ও চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্কতা দরকার।

সিংহ : শোক, দুঃখ, ভয়ভীতি সঙ্কটের মাঝে নির্ভীক, বুদ্ধিদীপ্ত, পরাক্রমী, সুন্দরের পূজারি ও সদ্ভাব বৃদ্ধি। স্ত্রীর বদান্যতায় পার্থিব সুখ, বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি এবং প্রতিকূল পরিবেশের অবসান। সন্তানের মেধা ও ধনার্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি। জুয়েলারি, বস্ত্র ও কসমেটিক ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। সন্তান লাভের সম্ভাবনা।

কন্যা : যানবাহন-সম্পত্তি ব্যবসা ও মিত্রস্থান হিতকারী। সফল উদ্যোগ-কর্মে দক্ষতার পূর্ণ মূল্যায়ন ও শংসা। শৌখিন রুচিসম্মত পোশাক, খাদ্যগ্রহণ। প্রিয়জনের সান্নিধ্যে মানসিক প্রশান্তি। কর্মপ্রার্থীদের সার্থক প্রয়াস। গৃহে শুভ অনুষ্ঠান ও বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। টেনশন মুক্ত জীবন।

তুলা : জমি, বাড়ি অথবা নতুন কোনও উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য— বিদেশযাত্রা। সমাজ সেবা ও সৃজনশীলতায় সাধুবাদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সান্নিধ্যে মানসিক তৃপ্তি। শিল্পী ও কলাকুশলীদের জীবিকার নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার মূল্যায়ন, পদমর্যাদা বৃদ্ধি। কর্মপ্রর্থীদের কর্মলাভ। বিনিয়োগ লভ্যাংশে শুভ। উচ্চশিক্ষা-গবেষণা- সম্মান। জীবন সঙ্গিনীর পদোন্নতি। গৃহসংস্কার ও বাহনযোগে আভিজাত্য গৌরব। শনির সাড়েসাতি জনিত মানসিক অস্থিরতা থাকলেও প্রেমানন্দে ভরা জোয়ার— সুন্দরের পূজারি ও স্নেহপ্রবণ মন। উদর ও শ্বাসকষ্টে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ধনু : কর্মক্ষেত্রে প্রবাস, প্রণয়ী থেকে পত্নীরূপে প্রকাশ। স্ত্রীর উৎসাহে মিত্র ও অর্থাগমের নতুন দিশা। অগ্রজের পদোন্নতি, পরিবহণ ব্যবসা ও পৈতৃক সূত্রে লাভবান। লেখক, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন শিল্পীদের ব্যস্ততা, সম্মান ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। রাজনীতিকদের ভুল সিদ্ধান্তে মানসিক চাপ ও পিছু হটা।

মকর : প্রতিবেশী ও সুহৃদদের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি। আর্থিক প্রতিকূলতা--- শত্রুতা ও শরীরের বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মানসিক উদ্বেগ। বিদ্যার্থীদের অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ। কর্মপ্রার্থীদের কর্ম লাভ। ভূসম্পত্তি বিক্রয় বিরোধিতা হ্রাস--- ব্যয়াধিক্য। পেটের গোলযোগ।

কুম্ভ : মিত্র, প্রতিবেশী ও অগ্রজের সম্পর্কের উন্নতি— সকলের ভাগ্যাকাশে নব সূর্যোদয়। সাধু-সজ্জন সম্পর্ক ও গুরুজনে ভক্তিশ্রদ্ধা। কারো বিবাহের সিদ্ধান্ত স্থির হতে পারে। স্ত্রীর অসংলগ্ন কথাবার্তায় সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব। বিদ্যার্থী ও সন্তানের প্রতিভার বহুমুখী প্রকাশ ও রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি।

মীন : রমণীর রহস্য জানতে ব্যর্থ মনোরথ। সময়ের অপচয় ও ছন্দপতন। বিদ্যার্থীর উচ্চশিক্ষায় প্রবাস। সহনশীলতায় নব ভাবনার উন্মেষ। উচ্চপদস্থের স্নেহবর্ষণে প্রতিষ্ঠা ও মানসিক তৃপ্তি। শিল্পী ও কলাকুশলীদের সৃষ্টির দক্ষতায় মানব সমাজের সমৃদ্ধি। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য